মাসিক

আত-তাহরীক

‘যার সামর্থ্য আছে অথচ সে কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়’ (ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৪৯০)।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web : www.at-tahreek.com
২৪তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা
জুলাই ২০২১

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

جلد : ٢٤، عدد : ١٠، ذو القعدة و ذوالحجة ١٤٤٢هـ/ يوليو ٢٠٢١م

رئيس مجلس الإدارة : **الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب**

تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : মুহাম্মাদী সিটি মসজিদ, ওসকেমেন, কাজাখস্তান।

دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-

٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-

٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهرية ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**

Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.

Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.

Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Rajshahi, Bangladesh.

Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK Nawdapara (Am Chattar, Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154,
Circulation Department : 01558-340390, E-mail: tahreek@ymail.com

Monthly AT-TAHREEK has been running since September 1997 from Rajshahi, Bangladesh. It is a reputed Islamic research Journal of Bangladesh, preaches true features of Islam based on the way pious predecessors (Salaf Saleheen). This journal is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, directed to establish a pure Islamic society in Bangladesh based upon the pure Tawheed and Sunnah.

ST মেসার্স সুমন ট্রেডার্স

প্রোঃ মোঃ জনাব আলী

M ০১৭১৫-৬৫১৭৫৭
G ০১৯১৯-৯৩৫৯৮৪
S ০১৭১১-৯৩৫৯৮৪

এখানে খেজুর, কিসমিস, কাঠবাদাম, কাজুবাদাম, পেসতা বাদাম দারুচিনি, লবঙ্গ, জিরা, এলাচ, ধনিয়া, মহুরী, কালোজিরা, মেথি আমলা, তেজপাতা প্রভৃতি খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

দোকান নং ৩৯-৪০, আর.ডি.এ মার্কেট, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক

আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة و أدبيـــة

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২৪তম বর্ষ	১০ম সংখ্যা
যুলক্বা'দাহ-যুলহিজ্জাহ	১৪৪২ হিঃ
আষাঢ়-শ্রাবণ	১৪২৮ বাং
জুলাই	২০২১ খৃঃ

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৭৯-৩৪০৩৯০ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ প্রবন্ধ :

♦ ইস্রাঈলীদের মন্দ পরিণতি ০৩
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

♦ অপরিবর্তনীয় জ্ঞান বনাম পরিবর্তনীয় জ্ঞান ০৮
-প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া

♦ তাহরীকে জিহাদ : আহলেহাদীছ ও আহনাফ ১১
-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

♦ যিলহজ্জ মাসের ফযীলত ও আমল ১৫
-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ

♦ নববী চিকিৎসা পদ্ধতি *(৪র্থ কিস্তি)* ২২
-ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী

♦ অল্পে তুষ্টি *(৩য় কিস্তি)* *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ২৭

♦ মাসায়েলে কুরবানী ৩০
-আত-তাহরীক ডেস্ক

◈ সাময়িক প্রসঙ্গ :

♦ ইস্রাঈলের সঙ্গে অঘোষিত সম্পর্ক কেন অনুচিত ৩৪
-কামাল আহমাদ

◈ মহিলাদের পাতা :

♦ পর্দা : বন্দীত্ব নয় স্বাধীনতা *-নিশাত তাসনীম* ৩৬

◈ হাদীছের গল্প :

♦ খুৎবাতুল হাজাতের গুরুত্ব ও ব্যক্তির উপরে তার প্রভাব ৩৮

◈ অমর বাণী : *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩৯

◈ চিকিৎসা জগৎ :

♦ করোনা থেকে সেরে ওঠার পরও যেসব শারীরিক ও মানসিক জটিলতা থেকে যায় ৪০

◈ ক্ষেত-খামার : ৪১

♦ বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরে দুগ্ধখামারি

♦ রাজস্থানের দুম্বা-ছাগলে বদলে গেছে সোহেলের স্বপ্ন

◈ কবিতা : ৪২

♦ মৃত্যু তোমাকে ♦ যুগের মুওয়াযযিন

♦ ছহীহ সুন্নাহ্র পথ ♦ ওরস

◈ স্বদেশ-বিদেশ ৪৩

◈ মুসলিম জাহান ৪৫

◈ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৫

◈ সংগঠন সংবাদ ৪৬

◈ প্রশ্নোত্তর ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী | সম্পাদকীয় | ২৪তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা জুলাই ২০২১

হে প্রভু! একটা শ্বাস দাও

শ্বাস-প্রশ্বাসের মূল্য যে কত বেশী, সেটা কেবল সেই-ই বুঝে যে মহামারি করোনায় চূড়ান্ত শ্বাসকষ্টের সম্মুখীন হয়েছে। করোনা মূলতঃ ফুসফুসে হানা দেয়। আর তাই প্রয়োজন হয় অক্সিজেনের। বুকের মধ্যে রক্ষিত ফুসফুস বা ফুল্কা এই অক্সিজেন সিলিণ্ডারের কাজ করে এবং সারা জীবন আমাদের জন্য অক্সিজেন সরবরাহ করে। প্রতি মিনিটে গড়ে ১২-১৮ বার শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে থাকলে জীবনে কত লক্ষ-কোটি বার এই সিলিণ্ডার আমাদের অক্সিজেন দিয়েছে, তা একবার ভেবেছি কি? বর্তমান বাযারে ১২ লিটারের একটি সাধারণ অক্সিজেন সিলিণ্ডারের দাম ১০ থেকে ২৫ হাযার টাকা। যা দুই থেকে পাঁচ ঘণ্টা চলে। পরে তাতে আবার অক্সিজেন ভরতে হয়। একবার ভাবুন কত কোটি টাকার অক্সিজেন আমরা বিনা পয়সায় বিনা চেষ্টায় সর্বদা পাচ্ছি। বাতাসে নাইট্রোজেনের পরিমাণ শতকরা ৭৮ ভাগ, যা ভূমির উর্বরা শক্তি বাড়ায় এবং গাছের বৃদ্ধি ঘটায়। আর অক্সিজেনের পরিমাণ ২১ ভাগ, যা উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতকে বাঁচিয়ে রাখে। অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি হ'লে দাবানল সৃষ্টি হয়। কার হুকুমে ও কার ব্যবস্থাপনায় ঐ সরবরাহের পরিমাণ ঠিক থাকছে? গাছ হ'ল জীবন্ত অক্সিজেন সিলিণ্ডার। যা দিনের বেলায় প্রাণীজগতের জন্য অক্সিজেন ছাড়ে। এজন্য সুন্দরবনকে বলা হয় 'দেশের ফুসফুস'। কারণ সেখানকার জঙ্গলে উৎপাদিত অক্সিজেন দেশের প্রাণীজগতকে রক্ষা করে। তাই বৃক্ষ রোপণকে গুরুত্ব দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তুমি বেঁচে থাকতে যদি ক্বিয়ামত এসে যায়, আর তখন যদি তোমার হাতে একটি চারা গাছ থাকে, তাহ'লে সেটি রোপণ কর' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৭৯)*। তিনি বৃক্ষ রোপণকে 'ছাদাক্বা' হিসাবে ঘোষণা করেছেন *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৯০০)*। তিনি মক্কা ও মদীনার 'হারাম' এলাকায় বৃক্ষ কর্তন নিষিদ্ধ করেন *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২৭১৫, ২৭৩২)*। তাছাড়া বৃক্ষের প্রতিটি পত্র-পল্লব আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। অতএব সাধ্যমত বৃক্ষ রোপণ করা আবশ্যক। বিশেষ করে নিম গাছ। যা সর্বাধিক ঔষধিগুণ সম্পন্ন। এছাড়া তাল গাছ, যা বজ্রপাত থেকে রক্ষা করে। ফলে একটি গাছ কাটার আগে তিনটি গাছ লাগান। বাড়ীর চারদিকে সবুজের বেষ্টনী গড়ে তুলুন। সর্বদা চক্ষু শীতল রাখুন!

দেশের খ্যাতিমান আর্কিটেক্ট জামীলুর রেজা চৌধুরী (১৯৪৩-২০২০) গত বছর রামাযানের রাত্রিতে খেয়ে-দেয়ে সুস্থহালে ঘুমিয়ে গেলেন। সাহারীর সময় আর ঘুম ভাঙলোনা। দেখা গেল নিঃশ্বাস চলছেনা। অর্থাৎ অক্সিজেন দাতা অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে এই মূল্যবান মানুষটির প্রাণহীন দেহ এখন মাটির খোরাক। শ্বাস বন্ধ হওয়াতেই সব বন্ধ। বন্ধু মহলে হায় হায় রব উঠল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তিনি এখন নতুন জীবনের মুসাফির। জানিনা সেখানে তিনি কেমন আছেন!

ফুসফুস হ'ল শ্বাসযন্ত্র। এর প্রধান কাজ হ'ল বাতাস থেকে অক্সিজেনকে রক্ত প্রবাহে নেওয়া এবং রক্ত প্রবাহ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডের অপ্রয়োজনীয় অংশ বাতাসে নিষ্কাশন করা। এই গ্যাস আদান-প্রদান করা হয় বিশেষ কোষ দ্বারা তৈরী খুবই পাতলা দেওয়াল বিশিষ্ট লক্ষাধিক বায়ুথলির দ্বারা। এছাড়া অক্সিজেন সরবরাহের প্রধান মাধ্যম রক্তের লোহিত কণিকা, যার আয়ু ১২০ দিন বা চার মাস। অন্যদিকে শ্বেতকণিকা, যা নানা ধরনের সংক্রামক ব্যাধি থেকে মানুষকে রক্ষা করে, তার আয়ু বড় জোর ৩-১৫ দিন। এই সাথে রক্তের প্লেটলেট। যা সূতার আঁশের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র কোষ। যা দেহের ক্ষতস্থানের রক্ত জমাট বাঁধানোর কাজে নিয়োজিত থাকে। যদি এটা না থাকতো, তাহ'লে যেকোন ক্ষতে দেহের সব রক্ত বেরিয়ে গিয়ে মানুষ মৃত্যুবরণ করত। অথচ এর আয়ু বড় জোর ৫-৭ দিন। এগুলি সবই মরছে আবার পুনর্জন্ম হচ্ছে। এভাবে ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ড তথা লাংস্ ও হার্ট প্রাণীদেহের এই জটিলতম যন্ত্র দু'টির মধ্যে সর্বদা হায়াত-মঊত ও পুনর্জন্মের খেলা চলছে। তাই ক্বিয়ামত তথা আখেরাতে জওয়াবদিহির কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই সম্ভবতঃ আল্লাহ বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস পাঠিয়েছেন। যা প্রধানত ফুসফুসে আক্রমণ করে। আল্লাহ বলেন, 'আর সে আমাদের সম্পর্কে নানাবিধ উপমা দেয়। অথচ সে নিজের সৃষ্টি বিষয়ে ভুলে যায়। সে বলে, কে হাড্ডিগুলিকে জীবিত করবে যখন তা পচে-গলে যাবে?' 'বলে দাও, ওগুলিকে তিনিই জীবিত করবেন, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন...' *(ইয়াসীন ৩৬/৭৮-৭৯)*।

করোনায় কারু ফুসফুসের অল্প ও কারু বেশী আক্রান্ত হয় আল্লাহর হুকুমে। যারা বেঁচে যায় তাদেরকে 'করোনা বিজয়ী' বলে মূর্খরা অভিনন্দন জানায়। এমনকি এরা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার সময় সবাইকে দু'আঙ্গুল উঁচু করে 'ভি' চিহ্ন দেখায়। অথচ আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না। আর যারা মরে যায়, তাদের আপনজনেরা লাশ নিতে চায় না নিজেরা সংক্রমিত হয়ে মরার ভয়ে। অথচ অন্যেরা তাদের গোসল-কাফন-দাফন করে। সে জানেনা যে, করোনা ছোঁয়াচে হ'লেও তা আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কার্যকর হয় না। আর মৃত্যুর পরে তা আর ছোঁয়াচে থাকে না। এভাবে দুনিয়াতেই আমরা ক্বিয়ামতের দৃশ্য সর্বদা অবলোকন করছি। এরপরেও কি মানুষ দুনিয়ার আরাম-আয়েশের পিছনে ছুটবে? সে কি তার পরকালীন জীবনের পাথেয় সঞ্চয়ে ব্রতী হবে না?

গ্রীকদের অদ্বৈতবাদ, যা মৃত্যুর পর স্রষ্টার মধ্যে বিলীন হওয়ার কথা বলে। হিন্দুদের জন্মান্তরবাদ, যা মৃত্যুর পর কর্মভেদে পশু-পক্ষী, গাছ-পাথর ইত্যাদি রূপে পুনর্জন্মের কথা বলে। বৌদ্ধদের নির্বাণবাদ, যা পরকালে মানুষকে কোনরূপ কর্মফল পাওয়া থেকে নিরাশ করে। এইসব কাল্পনিক দর্শনের বিরুদ্ধে ইসলামের সত্য দর্শন মানুষকে মৃত্যুর পরে ভাল-মন্দ ফলাফল লাভের নিশ্চয়তা দেয়। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট ফিরিয়ে নেওয়া হবে। অতঃপর সেদিন প্রত্যেকে স্ব স্ব কর্মফল পুরোপুরি প্রাপ্ত হবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*। আর এটাই ছিল কুরআনের সর্বশেষ আয়াত। যা রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৭ বা ২১ দিন পূর্বে নাযিল হয়। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের উপাস্য মাত্র একজন। অতঃপর যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর হয় সত্যবিমুখ এবং তারা হয় অহংকারী' *(নাহ্ল ১৬/২২)*। তিনি স্বীয় নবীকে বলেন, 'নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে' *(যুমার ৩৯/৩০)*। একদিন জিব্রীল এসে তাঁকে বলেন, 'হে মুহাম্মাদ! যতদিন খুশী জীবন যাপন করুন। কিন্তু মনে রাখুন আপনি মৃত্যুবরণ করবেন। যার সাথে খুশী বন্ধুত্ব করুন। কিন্তু মনে রাখুন আপনি তাকে ছেড়ে যাবেন। যা খুশী কাজ করুন। কিন্তু মনে রাখুন আপনি তার ফলাফল পাবেন...' *(হাকেম ৪/৩৬০, হা/৭৯২১; ছহীহাহ হা/৮৩১)*। একদিন জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, কে সবচাইতে বিচক্ষণ? তিনি বললেন, 'মৃত্যুকে সর্বাধিক স্মরণকারী এবং পরকালীন জীবনের জন্য সর্বাধিক সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণকারী' *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯)*। অতএব হে বিচক্ষণ! তোমার প্রতিটি পদক্ষেপকে পরকালীন পাথেয় সঞ্চয়ে ব্যয় কর।

হে মানুষ! তোমার প্রতিটি নিঃশ্বাসের মূল্যায়ন কর। শ্বাস-প্রশ্বাসের মালিককে ভয় কর। অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলেও তুমি তার বিনিময় পাবে। আর অণু পরিমাণ মন্দকর্ম করলেও তুমি তার শাস্তি পাবে, যদি সাথে সাথে তওবা না কর। একবার তাকাও তোমার শ্বাসকষ্টে কাতর নিকটজনের মলিন চেহারার দিকে। দেখ একটু নিঃশ্বাস ফিরে পাওয়ার জন্য তার চরম আকুলি-বিকুলি। দুনিয়ার সবকিছু দিয়েও কি তুমি তাকে একটা নিঃশ্বাস এনে দিতে পারবে? অতএব সাবধান হও! তোমার প্রতিটি নিঃশ্বাস তার মালিকের পথে ব্যয় কর *(স.স.)*।

ইস্রাঈলীদের মন্দ পরিণতি

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ইহূদী ও খৃষ্টান জাতি উভয়ে বনু ইস্রাঈলের অন্তর্ভুক্ত। ইস্রাঈল হ'ল হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর দ্বিতীয় নাম। যার অর্থ আল্লাহ্র দাস। তাঁর অধস্তন পুরুষ হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুসারীদেরকে 'ইহূদী' বলা হয়। যিনি ছিলেন বনু ইস্রাঈলের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ রাসূল। অতঃপর সর্বশেষ রাসূল ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদেরকে 'নাছারা' বা খৃষ্টান বলা হয়। সূরা ফাতেহায় বর্ণিত 'মাগযূব' (অভিশপ্ত) এবং 'যা-ল্লীন' (পথভ্রষ্টগণ) কারা, সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তারা হ'ল ইয়াহূদ ও নাছারাগণ'।[১] ইবনু আবী হাতেম বলেন, এ বিষয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে কোন মতভেদ আছে বলে আমি জানি না' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। ইহূদীরা তাদের নবীদেরকে হত্যা করে এবং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে অভিশপ্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে নাছারারা তাদের নবী ঈসা (আঃ)-কে অতিরঞ্জিত করে আল্লাহ্র আসনে বসিয়ে এবং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে চিনতে পেরেও না চেনার ভান করে ও তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতা করে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

বস্তুতঃ যারা যিদ ও অহংকার বশে অভিশপ্ত হয়েছে, তাদের সেরা হ'ল ইহূদী জাতি। আর যারা মূর্খতা ও অজ্ঞতা বশে পথভ্রষ্ট হয়েছে, তাদের সেরা হ'ল খৃষ্টান জাতি। ফলে ইহূদী ও খৃষ্টান উভয় জাতিই এক স্তরে চলে গেছে। অতঃপর সর্বযুগে মুক্তিপ্রাপ্ত দল হ'ল তারাই, যারা ছিরাতে মুস্তাক্বীমের অনুসারী হয়েছে। আখেরী যামানায় তারা হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসারী মুসলিমগণ। যে বিষয়ে বিদায় হজ্জে আইয়ামে তাশরীক্বের ২য় দিনের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'হে জনগণ! আমি তোমাদের নিকট এমন বস্তু রেখে যাচ্ছি, যা মযবুতভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ'।[২]

(১) মূসা (আঃ)-এর অবাধ্যতা :

মূসা (আঃ)-এর দো'আয় মিসরের অত্যাচারী সম্রাট ফেরাঊনের সাগরডুবির মাধ্যমে তার হাতে নির্যাতিত বনু ইস্রাঈলদেরকে নিরাপদে উদ্ধার করার পর শাম যাওয়ার পথে একস্থানে জাঁকজমকপূর্ণ মূর্তিপূজা দেখে তারা আবদার করে বলে, 'হে মূসা! আমাদের জন্যেও এরূপ উপাস্য বানিয়ে দাও, যেমন এদের অনেক উপাস্য (মূর্তি) রয়েছে! জবাবে মূসা তাদের বলেন, 'তোমরা তো একটা মূর্খ জাতি' *(আ'রাফ ৭/১৩৮)*। তিনি বলেন, 'এসব লোক যে কাজে লিপ্ত রয়েছে তাতো ধ্বংস হবেই। আর যা কিছু তারা করছে, তাতো ফালতু কাজ'। 'তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের জন্য আল্লাহকে ছেড়ে অন্য উপাস্য তালাশ করব? অথচ তিনি তোমাদেরকে বিশ্ববাসীর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন' *(আ'রাফ ৭/১৩৯-১৪০)*।

হিত্ত্বাহ্র স্থলে হিনত্বাহ : বনু ইস্রাঈলগণ যখন জান্নাতী খাদ্য বাদ দিয়ে দুনিয়াবী খাদ্য খাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে যিদ ধরে বসলো, তখন আল্লাহ তাদের পার্শ্ববর্তী জনপদে যেতে বললেন। যেখানে তাদের চাহিদামত খাদ্য-শস্যাদি তারা সর্বদা প্রাপ্ত হবে। উক্ত জনপদে প্রবেশের সময় আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করার জন্য তিনি কতগুলি আদব ও শিষ্টাচার মান্য করার নির্দেশ দিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আর যখন আমরা বললাম, তোমরা প্রবেশ কর এ নগরীতে এবং এতে যেখানে খুশী খেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ কর। আর নগরীর ফটক দিয়ে প্রবেশ করার সময় সিজদা কর ও বলতে থাক (হে আল্লাহ!) 'আমাদের ক্ষমা কর'- তাহ'লে আমরা তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেব এবং সৎকর্মশীলদের আমরা সত্বর অতিরিক্ত আরও দেব' *(বাক্বারাহ ২/৫৮)*। কিন্তু বেআদবীর চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে তারা হিত্ত্বাহ-এর বদলে 'হিন্ত্বাহ' অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনার বদলে 'গমের দানা' বলতে বলতে এবং সিজদা বা মাথা নীচু করার পরিবর্তে পিছন দিকে পিঠ ফিরে প্রবেশ করল।[৩] এর মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে আল্লাহ পূজারীর বদলে পেটপূজারী বলে প্রমাণ করল। বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উক্ত প্রধান ফটককে আজও 'বাব হিত্ত্বাহ' বলা হয়ে থাকে *(কুরতুবী)*। পরে তাদের উপর নানাবিধ গযব নাযিল হয় *(বাক্বারাহ ২/৫৯)*। যা আজও হচ্ছে।

অথচ যদি তারা প্রথমেই মূসা (আঃ)-এর হুকুম মেনে নিয়ে জিহাদে অবতীর্ণ হ'ত, তাহ'লে তখনই তারা বিজয়ী হয়ে নগরীতে প্রবেশ করত। কিন্তু নবীর অবাধ্যতা করার কারণেই তাদের ৪০ বছর কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হ'ল। পরিশেষে তাদেরকে সেই জিহাদই করতে হ'ল, যা তারা প্রথমে করেনি ভীরুতা ও কাপুরুষতার কারণে। বস্তুতঃ ভীরু ব্যক্তি ও জাতি কখনো সম্মানিত হয় না।

'হিনত্বাহ' ও 'হিত্ত্বাহ' বলার মাধ্যমে আল্লাহ বস্তুবাদী ও আদর্শবাদী দু'প্রকার মানুষের পার্থক্য তুলে ধরেছেন। বস্তুবাদীরা বস্তুর লোভে মানবতাকে ও মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করে। পক্ষান্তরে ধার্মিক ও আদর্শবাদীরা তাদের ধর্ম ও আদর্শ রক্ষার জন্য বস্তুকে উৎসর্গ করে। ফলে মানবতা রক্ষা পায় ও মানব সভ্যতা স্থায়ী হয়। বাস্তবিক পক্ষে সে যুগ থেকে এ যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন নামে বস্তুবাদীগণ মানবতার ধ্বংসকারী হিসাবে নিজেদেরকে চিহ্নিত করেছে। ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধ এবং বর্তমানে ইরাক, আফগানিস্তান ও সিরিয়ায় স্রেফ তেল লুটের জন্য এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে স্রেফ নিজেদের হীন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তথাকথিত গণতন্ত্রী, ধর্মনিরপেক্ষ ও বস্তুবাদী রাষ্ট্রনেতাদের হুকুমে টন কে টন বোমা মেরে লাখ লাখ নিরীহ বনু আদমের জান-মাল ও ইযযত লুটে নেওয়া এরই প্রমাণ বহন করে। অথচ কেবলমাত্র তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসই মানবতাকে বাঁচিয়ে রাখে।

অবাধ্যতার পরিণতি :

মূসা (আঃ)-এর অবাধ্যতা করার ফল স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে মিসর ও শামের মধ্যবর্তী একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে

---

১. *তিরমিযী হা/২৯৫৪; ছহীহুল জামে' হা/৮২০২।*

২. *হাকেম ১/১৭১ পৃ. হা/৩১৮; মুওয়াত্ত্বা হা/৩৩৩৮; মিশকাত হা/১৮৬; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৭২৩-২৪ পৃ.।*

৩. *বুখারী হা/৩৪০৩ 'নবীদের কাহিনী' অধ্যায়।*

দীর্ঘ ৪০ বছর যাবৎ বন্দী রাখেন। যাকে 'তীহ্' প্রান্তর বলা হয়। এই উন্মুক্ত কারাগারে না ছিল কোন প্রাচীর, না ছিল কোন কারারক্ষী। তারা প্রতিদিন সকালে উঠে মিসর অভিমুখে রওয়ানা হ'ত। আর সারাদিন চলার পর রাতে আবার সেখানেই ফিরে আসত, যেখান থেকে সকালে তারা রওয়ানা হয়েছিল। কিন্তু কোনভাবেই তারা অদৃশ্য কারা প্রাচীর ভেদ করে যেতে পারত না। এভাবে চল্লিশ বছর পর্যন্ত হতবুদ্ধি অবস্থায় দিগ্বিদিক ঘুরে এই হঠকারী অবাধ্য জাতি তাদের দুনিয়াবী শাস্তি ভোগ করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'এই স্থান (বায়তুল মুক্বাদ্দাস) তাদের জন্য চল্লিশ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হ'ল। তারা যমীনে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরবে। অতএব তুমি এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য আক্ষেপ করো না' *(মায়েদাহ ৫/২৬)*।

তীহ্ প্রান্তরে ৪০ বছর বন্দী জীবন কাটানোর পর নবী ইউশা' বিন নূন-এর নেতৃত্বে জিহাদের মাধ্যমে তারা বিজয় লাভ করে ও নগরীতে প্রবেশ করে *(ইবনু কাছীর)*। এভাবে তাদের দীর্ঘ বন্দীত্বের অবসান ঘটে।

(২) দাঊদ (আঃ)-এর অবাধ্যতা ও তার পরিণতি :

বনু ইস্রাঈলের দ্বিতীয় রাসূল দাঊদ (আঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন তারা শনিবারে ইবাদতের দিন সাগরে মাছ না ধরে। কিন্তু তারা বিভিন্ন কৌশলে মাছ ধরতে থাকে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে বানর ও শুকরে পরিণত করে দেন *(বাক্বারাহ ২/৬৫-৬৬)*। এজন্য এদেরকে 'আছহাবুল ক্বেরাদাহ ওয়াল খানাযীর' অর্থাৎ বানর ও শুকরের বংশ বলা হয়।

(৩) ঈসা (আঃ)-এর অবাধ্যতা ও তার পরিণতি :

মূসা ও দাঊদের ন্যায় বনু ইস্রাঈলগণ তাদের বংশের শেষনবী ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে নানাবিধ চক্রান্ত করে। তারা প্রথমেই ঈসা (আঃ)-কে 'জাদুকর' বলে আখ্যায়িত করে *(মায়েদাহ ৫/১১০)*। অতঃপর তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। তারা জনৈক নরাধমকে ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করার জন্য পাঠায়। কিন্তু ইতিপূর্বে আল্লাহ ঈসা (আঃ)-কে উঠিয়ে নেওয়ায় সে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যায়। কিন্তু এরি মধ্যে আল্লাহ্র হুকুমে তার চেহারা ঈসা (আঃ)-এর সদৃশ হয়ে যায়। ফলে ইহূদীরা তাকেই ঈসা ভেবে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করে। আল্লাহ বলেন, 'তারা বলে, আমরা মারিয়াম-পুত্র ঈসা মসীহ আল্লাহ্র রাসূলকে হত্যা করেছি। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছিল, না শূলে চড়িয়েছিল। বরং তাদের জন্য সদৃশ বানানো হয়েছিল। আর যারা এতে মতভেদ করেছিল, তারা ঈসার বিষয়ে অবশ্যই সন্দেহে পতিত ছিল। এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই কেবল ধারণা ব্যতীত। আর নিশ্চিতভাবেই তারা তাকে হত্যা করেনি'। 'বরং তাকে আল্লাহ নিজের পানে উঠিয়ে নিয়েছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(নিসা ৪/১৫৭-১৫৮)*। এ যুগেও অনেক মুসলমান ঈসা (আঃ) সম্পর্কে সন্দেহে পতিত আছেন। সবকিছু লৌকিক জ্ঞান দিয়ে বুঝতে গিয়ে এই অলৌকিক বিষয়ে তারা ভ্রমে পতিত হয়েছেন।

ইস্রাঈলীদের বিভক্তি : ঈসার ঊর্ধ্বারোহনের পর তার অনুসারীরা চার দলে বিভক্ত হয়ে যায়। (১) ইয়াকূবিয়া। যারা বলত, তিনি ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ। কিছুদিন দুনিয়ায় থেকে এখন তিনি আকাশে উঠে গেছেন। (২) নুস্তূরিয়া। যারা বলত, তিনি ছিলেন আল্লাহ্র পুত্র *(তওবা ৯/৩০)*। (৩) ইস্রাঈলিয়া। যারা বলত, তিনি ছিলেন তিন উপাস্যের অন্যতম *(মায়েদাহ ৫/৭৩, ১১৬)*। আল্লাহ একজন, ঈসা একজন এবং তার মা মারিয়াম একজন। (৪) মুসলিম। যারা বলেন, তিনি ছিলেন আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল *(নিসা ৪/১৭১)*। আর এটাই হ'ল সঠিক *(কুরতুবী; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা মারিয়াম ৩৭ আয়াত)*।

পক্ষান্তরে হকপন্থী ইহূদী ও খৃষ্টানগণ ছিলেন মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম আসার পর প্রকৃত মুসলিমরাই হ'ল মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর যথার্থ অনুসারী। যেমন হিজরতের পর মদীনার ইহূদী ধর্মনেতা আব্দুল্লাহ বিন সালাম মুসলমান হয়ে যান। অন্যদিকে হাবশার খৃষ্টান সম্রাট নাজাশী ইসলাম কবুল করেন।[৪] সূরা ছফ ১৪ আয়াতে 'বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করলেন ও তারা বিজয়ী হ'ল' বলতে উম্মতে মুহাম্মাদীকে বুঝানো হয়েছে *(ইবনু কাছীর)*। যারা ঈসা ও মুহাম্মাদ উভয় নবীর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন ও দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হয়েছেন *(ফুরক্বান ২৫/৭০)*। আজও যেসব ইহূদী ও খৃষ্টান ইসলাম কবুল করবেন তারা উক্ত সৌভাগ্যের অধিকারী হবেন। নইলে জাহান্নামী হবেন *(মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০)*।

ইস্রাঈলীদের বিষয়ে আল্লাহ্র ভবিষ্যদ্বাণী : আল্লাহ বলেন, 'আর আমরা কিতাবে ফায়ছালা করে রেখেছিলাম যে, তোমরা জনপদে (শামে) দু'বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমরা অত্যন্ত বড় ধরনের বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হবে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৪)*। অর্থাৎ ইহূদী নেতারা সেখানে চরম বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয় এবং সর্বত্র বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর মিসরের আমালেক্বা সম্রাট জালূতকে অধিষ্ঠিত করেন। সে ছিল শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ। পরবর্তীতে আল্লাহ তালূতকে পাঠিয়ে জালূতকে ধ্বংস করে দেন বরং এককভাবে দাঊদের হাতে জালূত নিহত হন *(বাক্বারাহ ২/২৫১)*। কিন্তু ইহূদীরা আবার বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয় এবং সর্বত্র ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি করতে থাকে। তখন ইরাকের মাওছেল সম্রাট সানজারীব অথবা বাবেল সম্রাট বুখতানছর তাদের উপর চড়াও হন। তিনি বায়তুল মুক্বাদ্দাস সহ পুরা শামে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালান। ইহূদী নেতাদের হত্যা করেন ও বাকীদের বন্দী করে নিজ দেশে নিয়ে যান। এভাবে বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে তিনি ইহূদী শূন্য করে দেন *(কুরতুবী; ইবনু কাছীর)*।

ইহূদীদের অভিশপ্ত হওয়ার ১০টি কারণ : ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করায় আল্লাহ ইহূদীদের উপর নানাবিধ দুনিয়াবী গযব নাযিল করেন *(বাক্বারাহ ২/৫৯)*। তাদেরকে কেন শাস্তি দেওয়া হয়েছিল সূরা নিসা ১৫৫-৬১ আয়াতে সেগুলি বর্ণিত হয়েছে, যা সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

(১) তাদের ব্যাপক পাপাচার (২) আল্লাহ্র পথে বাধা দান (৩) সূদী লেনদেন (৪) অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ (৫) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা (৬) নবীগণকে হত্যা করা (৭) আল্লাহ্র পথে আগ্রহী না হওয়া এবং অজুহাত দেওয়া যে, আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন (৮) কুফরী করা (৯) মারিয়ামের

৪. দ্র. *সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ২৫৮, ৫৮৬ পৃ.*।

প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া (১০) ঈসাকে শূলে বিদ্ধ করে হত্যার মিথ্যা দাবী করা *(দ্র. নবীদের কাহিনী ২/২০১ পৃ.)*।

উল্লেখ্য যে, ঈসা (আঃ) তাঁর উপরে বিশ্বাসী সে যুগের ও পরবর্তী যুগের সকল খৃষ্টানের পাপের বোঝা নিজে কাঁধে নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শূলে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে খৃষ্টানদের দাবী স্রেফ প্রতারণা ও অপপ্রচার বৈ কিছুই নয়। আল্লাহ বলেন, 'একের বোঝা অন্যে বহন করবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*।

(৪) শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা :

বাবেল সম্রাট বুখতানছর কর্তৃক কেন'আন (ফিলিস্তীন) থেকে উৎখাত হওয়ার পর বাকী ইহূদীরা ইয়াছরিবে এসে বসবাস শুরু করেছিল এই উদ্দেশ্যে যে, তারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস হারিয়েছে। অতএব তারা এখন বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী থাকবে এবং নিয়মিত হজ্জ-ওমরাহর মাধ্যমে পরকালীন পাথেয় হাছিল করবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল যে, আখেরী নবীর আবির্ভাব যেহেতু মক্কায় হবে এবং তাঁর আবির্ভাবের সময় আসন্ন, অতএব তারা দ্রুত তাঁর দ্বীন কবুল করবে এবং তাঁর নেতৃত্বে পুনরায় বায়তুল মুক্বাদ্দাস দখল করবে। তবে তাদের ধারণা ছিল যে, আখেরী নবী অবশ্যই তাদের নবী ইসহাক-এর বংশে হবেন। কিন্তু তা না হয়ে ইসমাঈল-এর বংশে হওয়াতেই তারা তাঁকে অস্বীকার করল ও তাঁকে ধ্বংসের চক্রান্তে লিপ্ত হ'ল।

মদীনায় ইহূদীদের আধিক্য ছিল এবং নাছারা ছিল খুবই কম। তাদের মূল অবস্থান ছিল মদীনা থেকে নাজরান এলাকায়। যা ছিল ৭৩টি পল্লী সমৃদ্ধ খ্রিষ্টানদের একটি উন্নত নগরীর নাম। বর্তমানে সড়কপথে এটি মদীনা থেকে ১২০৫ কি.মি. দক্ষিণে ইয়ামন সীমান্তে অবস্থিত।

ইহূদী ও নাছারাদের মধ্যে তাওরাত-ইনজীলের কোন শিক্ষা অবশিষ্ট ছিল না। তাদের ধর্ম ও সমাজনেতারা ভক্তদের কাছে 'রব'-এর আসন দখল করেছিল। ইহূদীরা ওযায়েরকে 'আল্লাহর পুত্র' এবং নাছারারা মসীহ ঈসাকে 'আল্লাহর পুত্র' দাবী করেছিল *(তওবা ৯/৩০-৩১)*। বরং তারা মারিয়াম, ঈসা ও আল্লাহকে নিয়ে তিন উপাস্যের সমন্বয়ে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল *(মায়েদাহ ৫/৭৩)*। তাদের পীর-আউলিয়ারা ধর্মের নামে অবৈধ পন্থায় মানুষের অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন করত এবং তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতো *(তওবা ৯/৩৪)*। আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তারা তা হালাল করত এবং তাদের মন্দকর্মগুলি তাদের নিকট শোভনীয় বলে গণ্য হ'ত *(তওবা ৯/৩৭)*। এক কথায় তাওরাত-ইনজীলের বাহক হবার দাবীদার হ'লেও তারা ছিল পুরা স্বেচ্ছাচারী ও প্রবৃত্তিপূজারী।

রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা রটনা :

কা'ব বিন আশরাফ ছিল মদীনার খ্যাতনামা ইহূদী পুঁজিপতি, কবি ও চরম মুসলিম বিদ্বেষী। বদর যুদ্ধে কুরায়েশ নেতাদের চরম পরাজয়ে সে রাগে-দুঃখে ফেটে পড়ে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ও মুসলমানদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে সে কবিতা বলতে থাকে এবং কুরায়েশ নেতাদের কবিতার মাধ্যমে উত্তেজিত করতে থাকে। ফলে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশে ৩য় হিজরীর ১৪ই রবীউল আউয়াল তাকে হত্যা করা হয় *(বুখারী হা/৪০৩৭ প্রভৃতি)*। বর্তমান যুগে ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গকারী ব্লগারদের জন্য একই শাস্তি বিধেয়। যা কার্যকরী করা মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের কর্তব্য।

শেষনবীর বিরুদ্ধে ইহূদীদের চক্রান্ত : মদীনার তিনটি ইহূদী গোত্র বনু ক্বায়নুক্বা, বনু নাযীর ও বনু কুরায়যার নেতারা সর্বদা মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত থাকত। এসময় বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিজয়ে তারা চরমভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানাবিধ চক্রান্ত শুরু করে। এদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী, সম্পদশালী ও মুসলমানদের প্রতি সর্বাধিক বিদ্বেষপরায়ণ ছিল বনু ক্বায়নুক্বা। বদর যুদ্ধের পর ২য় হিজরীর ১৫ই শাওয়াল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের দুর্গ অবরোধ করেন ও দু'সপ্তাহ অবরোধের পর তারা আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হয়। এরপর একই কারণে ৪র্থ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে বনু নাযীরকে এবং ৫ম হিজরীর যিলহজ্জ মাসে বনু কুরায়যাকে বিতাড়নের মাধ্যমে মদীনাকে ইহূদীমুক্ত করা হয়।

বনু নাযীর খায়বরে নির্বাসিত হয়ে সেখান থেকে কুরায়েশদের সাথে ষড়যন্ত্র করে মদীনাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। ফলে তাদেরকে পুনরায় বিতাড়নের জন্য ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসে খায়বর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তারা সেখানে রাসূল (ছাঃ)-কে দাওয়াত দিয়ে তাঁকে বকরীর বিষমাখানো ভূনা রান খাইয়ে হত্যা করার চেষ্টা করে।[৫] কিন্তু আল্লাহর রহমতে তিনি বেঁচে যান।

একইভাবে তাদের চক্রান্তে মদীনায় রোমক হামলার আশংকা দেখা দেয়। ফলে ৮ম হিজরীর জুমাদাল ঊলা মাসে মুতার যুদ্ধ ও ৯ম হিজরীর রজব মাসে সর্বশেষ তাবূক অভিযান সংঘটিত হয়। এমনকি ১১ হিজরীতে মৃত্যুর দু'দিন আগেও রোমক হামলা প্রতিরোধের জন্য রাসূল (ছাঃ) ওসামা বিন যায়েদকে প্রেরণ করেন। এভাবে দেখা যায়, মদীনায় হিজরতের শুরু থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত অধিকাংশ যুদ্ধের পিছনে ইহূদী চক্রান্ত সক্রিয় ছিল। মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে অদ্যাবধি তাদের চক্রান্ত অব্যাহত রয়েছে।

সূদী কারবারী ইহূদী :

পৃথিবীর সকল এলাহী ধর্মে সূদ নিষিদ্ধ। অথচ মদীনার ইহূদীরা ছিল সূদী কারবারী ও দক্ষ ব্যবসায়ী। সেকারণ তারা ছিল সর্বাধিক সচ্ছল। সেই সাথে চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও কূট কৌশলের মাধ্যমে এরা স্থানীয় আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধাবস্থা জিইয়ে রাখতো এবং 'বিভক্ত কর ও শাসন কর' নীতির মাধ্যমে উভয় গোত্রের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতো। আসলে তারা উভয় গোত্রেরই শত্রু ছিল। তাদেরকে তারা সূদী কারবার ও অস্ত্র ব্যবসার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করত। এজন্য তাদের মূর্খতার প্রতি তাচ্ছিল্য করে তারা বলত, 'মূর্খদের ব্যাপারে আমাদের কোন দায়িত্ব নেই' *(আলে ইমরান ৩/৭৫)*। অর্থাৎ মূর্খদের সম্পদ ও মানবাধিকার হরণ করায় আমাদের কোন পাপ নেই।

বর্তমান বিশ্বের পরাশক্তিগুলি উন্নয়নশীল ও বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে তাদের সূদী কারবার ও অস্ত্র ব্যবসা পূর্বের

৫. বুখারী হা/৩১৬৯; মিশকাত হা/৫৯৩৫ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায় 'মু'জেযা সমূহ' অনুচ্ছেদ।

ন্যায় বজায় রেখে চলেছে। মুসলমানদের সম্পদ হরণ করায় ও তাদের মানবাধিকার বিনষ্ট করায় কোন পাপ নেই বলে আজও তাদের আচরণে প্রমাণ পাওয়া যায়। ভূগর্ভের তৈল লুট করার জন্য তারা ভূপৃষ্ঠের মানুষের রক্ত পান করছে গোগ্রাসে। কিন্তু এই রক্তচোষাদের রক্ত নেশা মিটছে না মোটেই। এজন্যেই এরা 'মাগযূব' (অভিশপ্ত) ও 'যা-ল্লীন' (পথভ্রষ্ট) বলে কুরআনে অভিহিত হয়েছে।[৬] অতএব মুসলিম রাষ্ট্রগুলির উচিৎ পুঁজিবাদী সূদী অর্থনীতি ছেড়ে ন্যায়বিচার ভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতি কায়েম করা।

ওছমানী খেলাফত ধ্বংসের কারণ ছিল ফিলিস্তীন ইস্যু :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক মদীনা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর থেকে ইহূদীরা মুসলমানদের স্থায়ী শত্রুতে পরিণত হয়। খেলাফতে রাশেদাহ, খেলাফতে উমাইয়া, আব্বাসীয়া, স্পেনীয় ও সর্বশেষ ওছমানী খেলাফতের সকল যুগে এরা বাহ্যিকভাবে মুসলিম সেজে ভিতর থেকে অন্তর্ঘাত মূলক কাজ করেছে। ওছমানী খেলাফত কালে তারা খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় খেলাফত ধ্বংসের কাজে লিপ্ত হয় এবং সেই সাথে ফিলিস্তীন দখলের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।

এই সময় আন্তর্জাতিক ইহূদী সংস্থার প্রধান থিওডোর হার্জেল (১৮৬০-১৯০৪ খৃ.) জার্মানী, বৃটেন ও ফ্রান্সের সাথে সম্পর্ক তৈরী করেন। তিনি তাদের কাছ থেকে ওছমানী খেলাফতের বিরুদ্ধে সমর্থন আদায়ে সক্ষম হন। এসময় খেলাফতে চলছিল চরম আর্থিক দৈন্য। এটাকে সুযোগ হিসাবে নিয়ে হার্জেল ওছমানী খলীফা ২য় আব্দুল হামীদের (১৮৭৬-১৯০৯ খৃ.) দরবারে ১৮৯৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তার বন্ধু নিওলনস্কিকে প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করেন। তিনি প্রস্তাব করেন, হে খলীফা! আমরা আপনার আর্থিক সংকট মোকাবিলার জন্য ২০ মিলিয়ন লীরা (তুর্কী মুদ্রা) দান করব। এর মধ্যে ২ মিলিয়ন থাকবে ফিলিস্তীনের জন্য এবং বাকী খেলাফতের ঋণ পরিশোধের জন্য। এছাড়া খলীফাকে প্রয়োজনে আমরা যেকোন ঋণ সহায়তা দেব'। তিনি বলেন, যদি আমরা ফিলিস্তীন পাই, তাহ'লে আমরা তুরস্কের জন্য আরও বহু অর্থ ও উপঢৌকন প্রদান করব'। জওয়াবে খলীফা বললেন, 'আমি এই পবিত্র ভূমির এক বিঘত পরিমান মাটিও হ্রাস করতে পারব না।...আমি আমার দেহে ব্যবচ্ছেদ ঘটাতে দেব না, যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি'।

সুলতানের এই কড়া জবাব পাওয়ার পর ইহূদী নেতারা অন্য পথ ধরেন। তারা তুরস্কে তাদের দোসর নব্য তুর্কীদের দিয়ে পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের প্রচারণা চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। ফলে তাদের ইঙ্গিতে নতুন সংগঠনের জন্ম হয় 'জমঈয়াতুল ইত্তিহাদি ওয়াত তারাক্কী' বা 'ঐক্য ও উন্নয়ন সংস্থা'।

তারা সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে গ্রুপিং সৃষ্টি করেন। সাথে সাথে তরুণদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উস্কানী দিয়ে তাদেরকে খলীফার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন। তারা ইসলামী জাতীয়তাবাদের স্থলে তুর্কী জাতীয়তাবাদের স্লোগান ও বিভিন্ন গান তৈরী করেন। বস্তুতঃ এই লোকগুলি ছিল ইস্রাঈলের গুপ্ত বাহিনী 'মোসাদ'-এর চর। যারা ইসলামকে মুমিনের জীবন থেকে সরিয়ে দিতে চায়। অতঃপর তারা খলীফাকে পদত্যাগে বাধ্য করে এবং তাকে গ্রীসের সালানীক দ্বীপে নির্বাসনে পাঠায়। তারা তাঁর ভাই ৫ম মুহাম্মাদকে (১৯০৯-১৯১৮ খৃ.) ক্ষমতায় বসায়।

এভাবে রাজধানী ইস্তাম্বুল যখন পুরাপুরি ইংরেজদের করতলগত হয়, তখন তাদের ইঙ্গিতে কামাল পাশাকে পদোন্নতি দিয়ে প্রধান সেনাপতি করা হয়। ইহূদীরা কামালকেই তাদের উদ্দেশ্য হাছিলের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। কিছুদিন পর তারা সুলতান ৫ম মুহাম্মাদকে সরিয়ে তার ভাই ৬ষ্ঠ মুহাম্মাদকে ক্ষমতায় বসায় (১৯১৮-১৯২২ খৃ.)। অতঃপর তাঁকে সরিয়ে ২য় আব্দুল মজীদ বিন সুলতান আব্দুল আযীযকে ক্ষমতায় বসায় (১৯২২-১৯২৪ খৃ.)। তিনি ছিলেন ওছমানী খেলাফতের ৩৭তম ও সর্বশেষ খলীফা। মুছতফা কামাল তাকে গৃহবন্দী করে রাখেন। এমনকি ছালাতের জন্য মসজিদে যেতে দিতেন না। কেননা তিনি বের হ'লেই মানুষ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় হুমড়ি খেয়ে পড়ত। অতঃপর ১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ তারিখে 'জমঈয়তুল ইত্তিহাদ'-এর এক সম্মেলনে চিরতরে 'খেলাফত' বিলুপ্তির প্রস্তাব গৃহীত হয়। এভাবে কামাল পাশার হাতেই খেলাফতের (৬৮০-১৩৪২ হি./১২৮১-১৯২৪ খৃ.) আলো নির্বাপিত হয়। যে আলোর নীচে মুসলমানেরা ৬৬২ বছর ধরে বসবাস করে আসছিল। ইংরেজরা কামাল পাশাকে 'আতাতুর্ক' অর্থাৎ 'তুর্কী জাতির পিতা' উপাধি দিয়ে ক্ষমতায় বসায়।[৭]

এভাবে ওমর (রাঃ) কর্তৃক ১৫ হিজরীতে ফিলিস্তীন অধিকারের পর থেকে ১৩৪২ হিজরী পর্যন্ত দীর্ঘ ১৩২৭ বছর ফিলিস্তীন মুসলিম অধিকারে থাকে। যদিও মাঝে ক্রুসেড যুদ্ধের সময় কিছু সাময়িক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। যা ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে গাযী ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর (১১৩৮-১১৯৩ খৃ.) হাতে শেষ হয়ে যায়। অতঃপর ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে পরাশক্তিগুলির মাধ্যমে কথিত 'ইস্রাঈল' রাষ্ট্র জন্ম নেয়। যা মূলতঃ তেল সম্পদে সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের উপর ছড়ি ঘুরানোর উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সূরা আ'রাফ ১৬৭ ও ১৬৮ আয়াতের মর্ম অনুযায়ী নিশ্চিতভাবেই এটি সাময়িক ঘটনা। এরা মিসকীনদের মত পরাশক্তিগুলির দয়ায় বেঁচে থাকবে এবং সর্বত্র লাঞ্ছিত হবে। অতএব কখনোই রাষ্ট্র হিসাবে এটি স্থায়ী হবে না। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

ইস্রাঈলীদের মন্দ পরিণতি :

আল্লাহ বলেন, 'যেখানেই তারা থাকুক না কেন তাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হবে, কেবলমাত্র আল্লাহর অঙ্গীকার ও মানুষের অঙ্গীকার ব্যতীত। তারা আল্লাহর ক্রোধ অপরিহার্য করে নিয়েছে এবং তাদের উপর পরমুখাপেক্ষিতা আপতিত হয়েছে। এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। কারণ ওরা অবাধ্য হয়েছে ও সীমালংঘন করেছে' *(আলে*

---

৬. সূরা ফাতেহা ৭ আয়াত; তিরমিযী হা/২৯৫৪।

৭. দ্র. ড. আলী ছাল্লাবী 'আদ-দাওলাতুল ওছমানিইয়াহ' বই।

ইমরান ৩/১১২)। এখানে ইহূদীদের স্থায়ী লাঞ্ছনার কথা বলা হয়েছে। তবে তারা বাঁচবে কেবল দু'ভাবে। এক- আল্লাহ্র অঙ্গীকার। আর সেটি হ'ল তাদের নারী-শিশুরা। দুই- মানুষের অঙ্গীকার। আর সেটি হ'ল মুসলমান বা অন্যদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে। যেমন তারা এখন টিকে আছে কতিপয় পরাশক্তির উপর ভর করে। তাদের স্বার্থ ফুরিয়ে গেলে ইহূদীদের লাঞ্ছনা বৃদ্ধি পাবে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত লাঞ্ছিত হয়েই থাকবে। আল্লাহ বলেন, '(হে রাসূল! তুমি স্মরণ কর) যখন তোমার পালনকর্তা (ইহূদীদের) জানিয়ে দেন যে তিনি তাদের উপর ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবশ্যই এমন সব লোকদের প্রেরণ করবেন, যারা তাদেরকে নিকৃষ্টতম শাস্তি দিতে থাকবে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা এবং তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান'। 'আর আমরা তাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে টুকরা টুকরা করে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেই। তাদের মধ্যে কেউ ভাল কেউ অন্য রূপ। আমরা তাদেরকে ভাল ও মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করি যাতে তারা ফিরে আসে' *(আ'রাফ ৭/১৬৭-৬৮)*।

ইতিপূর্বে তারা মিসরের আমালেক্বা সম্রাট জালূত ও পরে ইরাকের বাবেল সম্রাট বুখতানছরের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তারা জার্মান নেতা এডলফ হিটলার (১৮৮৯-১৯৪৫) কর্তৃক জার্মান অধিকৃত ইউরোপীয় অঞ্চল থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। যা 'হলোকস্ট গণহত্যা' (Holocaust genocide) বলে খ্যাত। যেখানে ২য় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে ৬০ লক্ষ ইহূদীকে হত্যা করা হয় বলে প্রসিদ্ধি আছে। যা ইউরোপের দুই তৃতীয়াংশ ইহূদীর সমান। বিশেষজ্ঞদের মতে, নাৎসি গণহত্যার সকল ঘটনা আমলে নিলে সর্বমোট নিহতের সংখ্যা দাঁড়াতে পারে নব্বই লক্ষ থেকে এক কোটি দশ লক্ষের মত।

এই ইহূদী নির্মূলকরণের পিছনে রাজনৈতিক কারণ যেটাই থাক না কেন, জার্মানীকে ইহূদীশূন্য করার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল তাদের সূদী কারবার ও দাদন ব্যবসা। যা সে দেশের তৃণমূল পর্যন্ত মানুষের রক্ত শোষণ করত। দেশের জনসংখ্যার এক শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও তারাই দেশের অর্থনীতির একচ্ছত্র অধিকারী ছিল। সাধারণ মানুষের মধ্যে ইহূদী বিদ্বেষ চরমে উঠেছিল। তাই হিটলার তাদের পরিচালিত ব্যাংক, ব্যবসা ও সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সিনেমা, ভিডিও গেমস, ধূমপান ও মাদক সহ নৈতিকতা বিরোধী সকল কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করেন এবং তা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করেন। অবশেষে তিনি তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার সিদ্ধান্ত নেন। যে সিদ্ধান্ত 'ফাইনাল সলিউশন' নামে খ্যাত। যার পরিণতিতে ঠাণ্ডা মাথায় সুপরিকল্পিতভাবে কয়েক বছরে ইহূদী নির্মূল অভিযান বাস্তবায়িত হয়। যা ছিল বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম সেরা নিকৃষ্টতম গণহত্যা।

কিন্তু এত কিছুর পরেও ইহূদীদের চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি। তারা এখন বিভিন্ন দেশে তাদের গুপ্ত বাহিনী 'মোসাদ'-এর মাধ্যমে বিপর্যয় সৃষ্টি করে চলেছে এবং ফিলিস্তীনীদের উপর অব্যাহত হামলা চালাচ্ছে। কথিত ইস্রাঈল রাষ্ট্রে তারা জমা হ'তে থাকলেও তাদের ধ্বংস অত্যাসন্ন। কেবল আল্লাহ্র হুকুমের অপেক্ষা।[৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের পূর্বে ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৫৫০৫)* এবং মাহদীর নেতৃত্বে সাত বছর পৃথিবী সুন্দর শাসনে ও সুবিচারে ভরিয়ে দিবেন।[৯] এসময় মুসলিমগণ তাঁর অনুসারী হবেন এবং ইহূদীরা দাজ্জালের অনুসারী হবে।[১০] তিনি বায়তুল মুক্বাদ্দাসের 'লুদ' নামক দরজার পাশে দাজ্জালকে হত্যা করবেন।[১১] তখন মুসলমানরা ইহূদীদের ব্যাপকভাবে হত্যা করবে। তারা পাথর ও গাছের পিছনে লুকাবে। সে সময় গাছ ও পাথরগুলি বলবে, এই যে আমার পিছনে একটা ইহূদী লুকিয়ে আছে।[১২] উক্ত হাদীছে বুঝা যায় যে, পৃথিবীতে যালেম-মযলূম আছে, কিন্তু দাজ্জাল নেই। কেননা অন্য হাদীছে বর্তমানে শিকলবন্দী দাজ্জালের বক্তব্য এসেছে এভাবে যে, যদি আমাকে এখান থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহ'লে আমি পুরা পৃথিবী ধ্বংস করে দেব মদীনা ব্যতীত' *(মুসলিম হা/২৯৪২ (১২১)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, মক্কা ও মদীনা ব্যতীত' *(মুসলিম হা/২৯৪৩ (১২৩); মিশকাত হা/২৭৪২)*।

ইহূদী-খৃষ্টান ও কাফিরদের বিষয়ে আল্লাহ্র হুঁশিয়ার বাণী

ইহূদী জাতি তাদের নবীদের হত্যা করেছে ও নানাবিধ কষ্ট দিয়েছে *(বাক্বারাহ ২/৬১)*। যা থেকে সাবধান করে আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে বলেছেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাকে মুক্ত করেন যা তারা রটনা করেছিল। বস্তুতঃ সে ছিল আল্লাহ্র নিকট অতীব মর্যাদাবান' *(আহযাব ৩৩/৬৯)*।

আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ইহূদী-নাছারাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা তাদের মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(মায়েদাহ ৫/৫১)*। তবে দুনিয়াবী ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য কাফির-মুশরিকদের সাথে বাহ্যিকভাবে সম্পর্ক রাখার অনুমতি রয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছে, 'মুমিন ছাড়া কোন কাফিরকে মুমিনগণ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে না। যদি কেউ এটা করে, তবে তাদের সঙ্গে আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি কি-না তোমরা তাদের থেকে কোনরূপ অনিষ্টের আশংকা কর (তবে বাহ্যিক সম্পর্ক রাখা যাবে)। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজ সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন। (মনে রেখ) সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে' *(আলে ইমরান ৩/২৮)*। একারণে ইসলাম ও ইসলামী খেলাফতের মৌলিক স্বার্থ ক্ষুণ্নকারী বিষয় সমূহ বাদে ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরী-বাকুরী ইত্যাদি বিষয়ে অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলার ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই। মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানগণ উপরে বর্ণিত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সতর্ক বাণী সমূহ অনুধাবন করবেন কি?

[নিবন্ধটি দৈনিক ইনকিলাব ৩১শে মে ও ১লা জুন ২০২১ রবিবার ও সোমবার 'সম্পাদকীয়' কলামে কিছুটা সংক্ষেপে প্রকাশিত হয়।-সম্পাদক]

---

৮. এ বিষয়ে বিস্তারিত পাঠ করুন : লেখক অনূদিত ও হাফাবা প্রকাশিত 'আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা' বই।
৯. আবুদাঊদ হা/৪২৮৫; মুসলিম হা/১৫৬; মিশকাত হা/৫৪৫৪; ৫৫০৭।
১০. মুসলিম হা/২৯৪৪; মিশকাত হা/৫৪৭৮।
১১. মুসলিম হা/২৯৩৭; তিরমিযী হা/২২৪৪; মিশকাত হা/৫৪৭৫।
১২. মুসলিম হা/২৯২২; মিশকাত হা/৫৪১৪।

অপরিবর্তনীয় জ্ঞান বনাম পরিবর্তনীয় জ্ঞান

*-প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া**

ইসলামী চিন্তার উপর প্রভাব বিস্তারকারী জ্ঞানকে অপরিবর্তনীয় জ্ঞান (infallible knowledge) ও পরিবর্তনীয় জ্ঞান (fallible knowledge) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।[১] অপরিবর্তনীয় জ্ঞান হচ্ছে নিখুঁত জ্ঞান, যা কখনই ভুল প্রমাণিত হবে না। অর্থাৎ সর্বদা সঠিক থাকবে। এই জ্ঞান হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের জ্ঞান।[২] কুরআন আল্লাহ তা'আলা অহি আকারে রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে মানবজাতির জন্য প্রেরণ করেছেন। আর আল্লাহ প্রেরিত অহি দ্বারা পরিচালিত হয়ে কুরআনের সঠিক বুঝ শিখিয়েছেন এবং দুনিয়াবী জীবনে কুরআনকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর নবুঅতী জীবনে। যা ছহীহ হাদীছ সমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের জ্ঞান ছাড়া মানুষের কাছে যত জ্ঞান আছে সবই পরিবর্তনীয় জ্ঞান বা অনিশ্চিত জ্ঞান। অর্থাৎ এই জ্ঞান ভুল প্রমাণিত হ'তে পারে। মানুষের অর্জিত জ্ঞানের মধ্যে সবচাইতে বিশুদ্ধ জ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞান। যার দ্বারা মানুষ অনেক উপকৃত হয়েছে এবং হচ্ছে। বিজ্ঞানের জ্ঞানও অপরিবর্তনীয় জ্ঞান (infallible knowledge) নয় এবং সে দাবী বিজ্ঞান কখনো করেনি। তার অর্থ বিজ্ঞানের জ্ঞানও পরিবর্তনীয় জ্ঞান (fallible knowledge)।[৩] বলা বাহুল্য, দুর্বল হাদীছও পরিবর্তনীয় জ্ঞানের (fallible knowledge) অন্তর্ভুক্ত। কেননা একটি দুর্বল হাদীছ রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ হ'তেও পারে আবার নাও হ'তে পারে। মানুষ ত্রুটিপূর্ণ। তাই তার জ্ঞানও অপূর্ণ।[৪]

গবেষকরা যখন কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা করেন বুদ্ধি, যুক্তি বা উপমার ভিত্তিতে, তখন সেই ব্যাখ্যাগুলো আর অপরিবর্তনীয় জ্ঞান থাকে না; বরং পরিবর্তনীয় জ্ঞানে পরিণত হয়। তাই পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের কোন ব্যাখ্যা যা মানুষ তাঁর বুদ্ধি, যুক্তি বা উপমার মাধ্যমে করেছে, সেটাকে পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের অপরিবর্তনীয় জ্ঞানের প্রতিযোগী হিসাবে দাঁড় করানো গ্রহণীয় হ'তে পারে না। কেননা পরিবর্তনীয় জ্ঞান, যা ভুল হ'তে পারে, তা কখনো অপরিবর্তনীয় জ্ঞানের, যা কখনো ভুল হ'তে পারে না, সমকক্ষ হ'তে পারে না। অর্থাৎ নিশ্চিত জ্ঞান আর অনিশ্চিত জ্ঞান কখনো সমান নয়। যখনই কোন মুসলিম দল বুদ্ধি, যুক্তি বা উপমার ভিত্তিতে করা কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের কোন ব্যাখ্যাকে বা কোন দুর্বল হাদীছকে কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের অপরিবর্তনীয় জ্ঞানের সমকক্ষ হিসাবে ব্যবহার করেছে অর্থাৎ 'ভুল হ'তে পারে' এমন জ্ঞানের উপর অটল থেকেছে এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অপরিবর্তনীয় জ্ঞানের দিকে ফিরে যেতে অস্বীকার করেছে, তখনই সেই দল বিপথগামী হয়েছে। পরিবর্তনীয় জ্ঞানের উপর অপরিবর্তনীয় জ্ঞানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের অপরিবর্তনীয় জ্ঞানের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা করাকে তাদের প্রধান মূলনীতি হিসাবে সাব্যস্ত করেছে। এক্ষণে আমরা ইসলামে বিপথগামী চিন্তা-ভাবনার কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরব, যা স্বভাবতই পরিবর্তনীয় জ্ঞান থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।

৩৭ হিজরী পর্যন্ত মুসলিম সমাজ পরিচালিত হয়েছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অপরিবর্তনীয় জ্ঞানের আলোকে। অতঃপর আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যকার রাজনৈতিক সংঘাতকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজে দু'টি বিপথগামী দলের আবির্ভাব হয়, খারেজী ও শী'আ। খারেজীরা তাঁদের বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা করে। আর সেই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তারা আইনসঙ্গত খলীফা আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং কবীরা গুনাহগারকে কাফের সাব্যস্ত করে। ফলে খোদ আলী (রাঃ)-কে তারা 'কাফের' বলে এবং তাঁকে হত্যা করে। অর্থাৎ তাদের ব্যাখ্যা যেটা ছিল পরিবর্তনীয় জ্ঞান, সেটাকে তারা অপরিবর্তনীয় জ্ঞান হিসাবে বিবেচনা করল। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিখুঁত জ্ঞান থেকে তারা বিচ্যুত হ'ল। একইভাবে শী'আরা তাঁদের বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সাব্যস্ত করল যে, মুসলিমদের খলীফা বা ইমাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) ঠিক করে দিয়েছেন এবং তা রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবারের মধ্যে সীমিত থাকবে। অর্থাৎ আলী (রাঃ)-এর বংশে সীমাবদ্ধ থাকবে। তারা হাতে গণা কয়েকজন ছাহাবী ব্যতীত সবাইকে 'কাফের' বলে। একইভাবে হযরত আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-কে তারা অবৈধ 'খলীফা' এবং 'কাফের' সাব্যস্ত করল। এছাড়া তারা আল্লাহর কিছু গুণ, যেমন অদৃশ্যের জ্ঞান, তাদের ইমামদেরকে দিল। যদিও শী'আদের সমস্ত ব্যাখ্যা ছিল 'ভুল হ'তে পারে' জাতীয় পরিবর্তনীয় জ্ঞান। তবুও তারা সেই জ্ঞানের উপর দৃঢ় থাকল এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অপরিবর্তনীয় জ্ঞানের দিকে ফিরে গেল না।

পরবর্তীকালে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অপরিবর্তনীয় জ্ঞানের সাথে বিরোধপূর্ণ বিজাতীয় সংস্কৃতি, ধর্মতত্ত্ব, পৌরাণিক

** প্রফেসর (অবঃ), ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয়েস, লুইজিয়ানা টেক ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা; কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটি অফ পেট্রোলিয়াম এ্যাণ্ড মিনারেলস্‌, সঊদীআরব; সুলতান ক্বাবূস ইউনিভার্সিটি, ওমান।*

১. *ডেভিড লুইস (১৯৯৬), ইলুইসিব নলেজ, অস্ট্রেলিয়ান জার্নাল অফ ফিলোসফী, খণ্ড ৭৪, নং ৪।*

২. *আল্লাহ বলেন, এই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই' (বাক্বারাহ ২/২)। তিনি স্বীয় রাসূল সম্পর্কে বলেন, 'তিনি নিজ খেয়াল-খুশীমত কোন কথা বলেন না'। '(যা বলেন) সেটি অহি ব্যতীত নয়, যা তার নিকট প্রত্যাদেশ করা হয়' (নজম ৫৩/৩-৪)।*

৩. *অ্যালান এফ. চার্লস, হোয়াট ইজ দিস থিং কলড সায়েন্স? (চতুর্থ সংস্করণ, ইন্ডিয়ানাপোলিস/ল্যামব্রিজ: হ্যাকেট পাবলিশিং কোম্পানী)।*

৪. *রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর শ্রেষ্ঠ ভুলকারী হ'ল তওবাকারীগণ (তিরমিযী হা/২৪৯৯; মিশকাত হা/২৩৪১)।*

কাহিনী, অধ্যাত্মবাদ, জীবনদর্শন, নানারূপ চিন্তাধারা, সত্য অনুসন্ধান পদ্ধতি ইত্যাদি মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে এবং মুসলিম চিন্তাবিদদের প্রভাবিত করেছে। ফলে বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর মতবাদের উদ্ভব হয়েছে। যেসব বিভিন্ন আকারে ও বিন্যাসে অদ্যাবধি মুসলিম সমাজে বিরাজমান রয়েছে। যেমন ক্বাদারিয়া, জাবরিয়া, মু'তাযিলা, মুরজিয়া, মা'রেফাত বা মরমীবাদ (mysticism) ইত্যাদি। এইসব মতবাদের সাধারণ নির্ধারক হ'ল এগুলো সবই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অপরিবর্তনীয় জ্ঞানের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে অথবা দুর্বল হাদীছ বা জাল হাদীছের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ পরিবর্তনীয় জ্ঞান বা 'ভুল হ'তে পারে' এমন জ্ঞানের উপর স্থাপিত। কিন্তু এসব মতবাদের অনুগামীরা তাদের মতবাদের প্রতি অবিচল থেকেছে এবং তাদের মতবাদকে অপরিবর্তনীয় জ্ঞান মনে করেছে। ফলে তারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অপরিবর্তনীয় জ্ঞানের দিকে ফিরতে চায়নি।

বিশেষভাবে (১) ক্বাদারিয়াগণ যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যার দাবী করে বলেন যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাই কেবল কার্যকর, আল্লাহ্র ইচ্ছা নয়। কেননা যদি আল্লাহ্র ইচ্ছা কার্যকর থাকে, তবে বিচার দিবসে আল্লাহ ইনছাফের সাথে বিচার করতে পারবেন না। এই মতবাদের আধুনিক অভিব্যক্তি Hill-এর Napoleon : Think and Grow Rich, best seller বইয়ের উক্তিতে ফুটে উঠেছে, 'You are the master of your destiny. You can influence, direct and control your own environment. You can make your life what you want it to be' ('তুমি তোমার ভাগ্যের নিয়ন্তা। তুমি তোমার পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পার, পরিচালনা করতে পার এবং যেভাবে চাও তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পার। তুমি তোমার জীবনকে যেভাবে চাও সেভাবে তৈরী করতে পার')। এটি হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার অনুপ্রেরণামূলক সাহিত্যের (Motivational Literature) মূল কথা।

এই তত্ত্বের বিপরীতমুখী হ'ল (২) জাবরিয়া মতবাদ। যারা তাদের বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে কুরআন এবং হাদীছের ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, কেবল আল্লাহ্র ইচ্ছাই কার্যকর, বান্দার ইচ্ছা নয়। কেননা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা কার্যকর হ'লে আল্লাহ যে সর্বশক্তিমান, তাঁর সেই গুণকে অস্বীকার করা হবে। এই মতবাদের বিষয়বস্তু বর্তমান বিশ্বের অন্যতম একটি বড় ধর্মীয় দলের দাওয়াতী প্রোগ্রামে প্রায়শ শোনা যায়- 'কিছু হইতে কিছু হয় না, যা কিছু হয় আল্লাহ হইতে হয়'। এতদ্ব্যতীত (৩) যুক্তি দিয়ে কুরআন এবং হাদীছের ব্যাখ্যার মাধ্যমে খারেজীদের এন্টিথিসিস হিসাবে মুরজিয়া মতবাদের উদ্ভব হ'ল। যার মূল ধারণা হচ্ছে কোন গুনাহ (কুফরী, শিরকী, কবীরা বা ছগীরা) দুনিয়াতে নির্ণয় করা যাবে না এবং এসব গুনাহের ফায়ছালা আখেরাতের জন্য রেখে দিতে হবে। অর্থাৎ একবার যে 'বিশ্বাসী' হ'ল কোন পাপই তাকে 'অবিশ্বাসী' করবে না। বর্তমান মুসলিম সমাজের বিরাট অংশ এই মতবাদের প্রতিধ্বনি করে বলে থাকেন যে, তাদের মধ্যে ঈমান ঠিক আছে। যদিও তাদের কোন আমল নেই। হালাল-হারামের বাছ-বিচার নেই এবং গুনাহ সম্বন্ধে কোন সংবেদনশীলতাও নেই। (৪) অপরদিকে যুক্তিকে সত্য অনুসন্ধানের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বা মানদণ্ড সাব্যস্ত করে যুক্তির আলোকে কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যা করাকেই সবচেয়ে ভালো উপায় মনে করল মু'তাযিলা সম্প্রদায়। এমনকি তারা যুক্তিকে অহি-র উপর স্থান দিয়ে যুক্তির ফায়ছালাকে চূড়ান্ত মনে করল। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন বা ছহীহ হাদীছকে যুক্তির অনুগামী করে দিল। এর দ্বারা তারা পরিবর্তনীয় জ্ঞানকে অপরিবর্তনীয় জ্ঞানের উপর স্থান দিল। যেমন যুক্তি দিয়ে কুরআন এবং হাদীছের ব্যাখ্যা করে তারা বলল যে, আল্লাহ এক এবং তাঁর কোন শুরু ও শেষ নেই। এখন যদি বলা হয়, আল্লাহ্র গুণও তাঁর ন্যায় সনাতন ও অবিচ্ছিন্ন এবং তার কোন শুরু ও শেষ নেই, তবে সেটি শিরক হবে। তাই তারা আল্লাহ্র গুণাবলীকে অস্বীকার করল। তাদের মতবাদ অনুযায়ী কুরআন সৃষ্ট। মুমিন আখেরাতে আল্লাহকে দেখতে পাবে না। জান্নাত ও জাহান্নাম বিচার দিবসে অস্তিত্ব লাভ করবে ইত্যাদি।

বস্ততঃ মু'তাযিলাদের অনুকরণে যুক্তিকে চূড়ান্ত মানদণ্ড বিবেচনা করে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের যুক্তিভিত্তিক ব্যাখ্যা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি যুক্তির ছত্রছায়ায় ধারণা, কল্পনা, আবেগ, পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ এবং নেতা বা আকাবেরদের উপর বুদ্ধিবৃত্তিক (intellectual) নির্ভরতা, এসব কিছুকে ব্যবহার করা হচ্ছে কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে। আক্বীদা ও আমলের প্রায় কোন অংশই যুক্তিভিত্তিক ব্যাখ্যাসমূহের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। যেমন 'আল্লাহ্র হাত' অর্থ তাঁর কুদরত, 'আল্লাহ্র কালাম' অর্থ তাঁর মনের কথা, আল্লাহ্র কোন আকার নেই, সৃষ্ট সবকিছুর মধ্যে আল্লাহ্র নূর বা জ্যোতির প্রকাশ, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই, নবী ও আওলিয়াদের অসীলায় মুক্তি কামনা, নেককার ব্যক্তিদের রূহসমূহ মৃত্যুর পর দুনিয়াতে ফিরে এসে লোকদের প্রার্থনা শ্রবণ করে, তাছাউওফের ইলম হাছিল করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফরযে আয়েন, কবরস্থ আওলিয়াদের নূর তাদের মুরীদদের হৃদয়ে প্রবেশ করে, ইমামদের সিদ্ধান্তের বিপরীতে ছহীহ হাদীছ পাওয়া গেলেও ইমামদের সিদ্ধান্তের উপর অটল থাকতে হবে ইত্যাদি বক্তব্যসমূহ।

সংক্ষেপে পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখতে পেলাম কিভাবে পরিবর্তনীয় জ্ঞানকে অপরিবর্তনীয় জ্ঞানের মত ব্যবহার করে বিভিন্ন মতবাদ নির্ধারিত হয়েছে। পরিবর্তনীয় জ্ঞানের ভুল হ'তে পারে। সেকারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে প্রত্যাশিত বিনয়, নম্রতা বা শালীনতা থাকার কথা সেটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বরং এই সব অনিশ্চিত জ্ঞানকেই দৃঢ়তা, দাম্ভিকতা ও ঔদ্ধত্যের সাথে অনুসরণ করা হচ্ছে।

সবশেষে (৫) পরিবর্তনীয় জ্ঞানের ভিত্তিতে যে মতবাদটি এদেশে তথা ভারত উপমহাদেশে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ

করেছে, সেটি হ'ল মা'রেফাত বা অধ্যাত্মবাদ (mysticism)। যা বাহ্যত মু'তাযিলাবাদের এন্টিথিসিস তথা যুক্তির পরিবর্তে মরমী (mystic) ব্যক্তিত্বের আভ্যন্তরীণ জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভরশীল মতবাদ। অধ্যাত্মবাদ বা 'রহস্যবাদ' শব্দটি প্রাচীন গ্রীক উৎস থেকে এসেছে। যার অর্থ গোপন করা। এই মতবাদের বিভিন্ন ধরন সকল ধর্মীয় ঐতিহ্যে পাওয়া যায়। যেমন আদিবাসী ধর্মসমূহে, হিন্দুদের শমনবাদে, ইব্রাহীমী ধর্মসমূহে, ভারতীয় ধর্মগুলোতে, আধুনিক আধ্যাত্মিকতায় এবং নতুন যুগের ও নতুন ধর্মীয় আন্দোলনগুলিতে।[৫] ইসলামী মা'রেফাত (ছূফীবাদ) দাবী করে যে তাদের লক্ষ্য হচ্ছে, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল কিছু থেকে আত্মাকে দূরে সরিয়ে নেওয়া। যদিও বিষয়টি অনেক ব্যাপক এবং অবাস্তব। তথাপি এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে রহস্যবাদের কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে যা এই নিবন্ধটির থিমের (theme) সাথে সম্পর্কিত। যেমন বিভিন্ন আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে ছূফী শেখ (mystic leader) একটি অনন্য বা বিকল্প চেতনার স্তরে পৌঁছে যান। যেখানে স্রষ্টার সাথে তাঁর একটি বিশেষ যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি স্রষ্টার প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেন। আধ্যাত্মিক সত্য বা চূড়ান্ত বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত হন। তিনি দৈব সূত্রে প্রাপ্ত হন ও আদিষ্ট হন। তাঁর কাছে চূড়ান্ত সত্য প্রস্ফুটিত হয়। এমনকি তাঁরা স্রষ্টার সাথে এক হয়ে যান। ফল স্বরূপ তিনি অনেকটা নিখুঁত (infallible) অবস্থা লাভ করেন।

যেমনটি খৃষ্টানদের পোপবাদ তথা 'papal infallibility' ধারণাতে দেখা যায়। এই ধারণা মতে পোপ (Pope), যিনি বিশ্বব্যাপী ক্যাথলিক চার্চের প্রধান যাজক, তিনি ধর্মীয় ব্যাপারে যা বলেন তা সব ত্রুটি হ'তে মুক্ত। অর্থাৎ সেটি অপরিবর্তনীয় জ্ঞান এবং অনুসারীরা তা মানতে বাধ্য।[৬] পোপ তার ক্যাথলিক অনুসারীদের এবং সৃষ্টিকর্তার মাঝে একজন মাধ্যম স্বরূপ। যার অসীলায় অনুসারীরা স্রষ্টার নিকট প্রার্থনা, সাহায্য অন্বেষণ এবং তাদের আধ্যাত্মিক লক্ষ্যসমূহ অর্জন করেন। অনুরূপভাবে মুসলমানদের ছূফী শেখরা আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সুফারিশকারী হিসাবে অধিষ্ঠিত। তাদের মাধ্যমে অনুসারীরা স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন করে, স্রষ্টার নিকট থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হয়, ধর্মীয় লক্ষ্য হাছিল করে এবং জান্নাত প্রাপ্তির নিশ্চয়তা লাভ করে।

এভাবে ছূফীবাদ প্রতিষ্ঠানটি আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে সরাসরি চ্যানেলের পরিবর্তে একটি পরোক্ষ চ্যানেল প্রতিষ্ঠিত করেছে। ছূফী শেখরা তাদের পরিভাষায় 'হাল' অর্জনের দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মীয় বিষয়ে তথা বিশ্বাস ও কর্ম উভয় ক্ষেত্রে সৃজনশীল (innovative) হয়ে উঠেছেন এবং নতুন নতুন বিশ্বাস ও আমল চালু করেছেন ও করে যাচ্ছেন। যেমন যিকরের নিত্য-নতুন শব্দ ও পদ্ধতি, বিভিন্ন প্রকারের ধ্যান (meditation), নতুন নতুন দরূদ, সর্বেশ্বরবাদ (pantheism), বিভিন্ন ধরনের খতম, অদ্বৈতবাদ (nondualism/monism), সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার প্রবেশ করা ও সেখানে বিলীন হওয়া এবং তার বিপরীতে সকল সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিকর্তার নূর বা জ্যোতির প্রকাশ, আল্লাহ নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান ইত্যাদি আক্বীদা। উপরন্তু ছূফীবাদ প্রতিষ্ঠানটি রাজবংশের ফর্ম (dynastic form) লাভ করেছে। অর্থাৎ ছূফী শেখদের কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও প্রভাব তাঁদের খলীফাদের মাধ্যমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে চলতে থাকে।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন একশ্রেণীর মুসলমান এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হচ্ছেন ও পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। যা কিনা পুরোটাই পরিবর্তনীয় জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা রহস্যময় এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তি কেন্দ্রিক। সর্বোপরি এটা কুরআন ও হাদীছের অপরিবর্তনীয় জ্ঞানের ভিত্তিতে স্থাপিত নয়। এর একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হয়তো Hofstede Gi national culture থিওরীতে পাওয়া যেতে পারে। এই থিওরী অনুযায়ী আমাদের সাধারণ জাতীয় সংস্কৃতির দু'টি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে power distance বা ক্ষমতার দূরত্ব এবং uncertainty avoidance তথা অনিশ্চয়তা পরিহার। Power distance বিশেষ কিছু ব্যক্তিকে উচ্চ মর্যাদায় স্থাপন করে এবং তাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্যশীল একটি বিশেষ শ্রেণী তৈরী করে। ছূফী শেখদের সুউচ্চ মর্যাদা দানের মধ্যে power distance-এর বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত রয়েছে। অতঃপর Uncertainty avoidance হচ্ছে ঝুঁকি না নেওয়া বা অনিশ্চয়তা পরিহার করা। ছূফী শেখরা জান্নাত পাওয়ার যেরূপ নিশ্চয়তা দেন, তা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এর সাথে তাদের মধ্যে রয়েছে দ্বীনের জ্ঞানের এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অপরিবর্তনীয় জ্ঞানের অভাব। তাই একশ্রেণীর মুসলমান ছূফী শেখদের মাঝে uncertainty avoidance তথা অনিশ্চয়তা পরিহার খুঁজে পান। ফলে তারা সেদিকে ধাবিত হন।

পরিশেষে সঠিক ও পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েমের জন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অপরিবর্তনীয় জ্ঞান এবং পরিবর্তনীয় জ্ঞানের পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন থাকা অতীব যরূরী। সর্বদা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অপরিবর্তনীয় জ্ঞানমুখী হওয়ার সংকল্প লালন করা আবশ্যক। পরিবর্তনীয় জ্ঞান ভিত্তিক বিশ্বাস ও আমল সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকতে হবে। কখনও কখনও পরিবর্তনীয় জ্ঞান ভিত্তিক বিশ্বাস ও আমল সবার অলক্ষ্যে, চুপিসারে বা ছদ্মবেশে মুসলমানদের মনে অনুপ্রবেশ করে এবং তাদেরকে বিভ্রান্ত করে। সেকারণ সর্বদা পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের অপরিবর্তনীয় জ্ঞান অন্বেষণ ও চর্চা অব্যাহত রেখে সকল বিভ্রান্তি থেকে সুরক্ষা পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

---

৫. দ্য স্ট্যানফোর্ড এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ফিলোসফী (২০১৬), দ্য মেটাফিজিক্স রিসার্চ ল্যাব, সেন্টার ফর স্টাডি অফ ল্যাংগুয়েজ অ্যাণ্ড ইনফরমেশন, স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা।

৬. https://en.wikipedia.org/wiki/Papal_infallibility

তাহরীকে জিহাদ : আহলেহাদীছ ও আহনাফ

*মূল (উর্দূ): হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ****

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক****

[ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আহলেহাদীছদের অবদান অতুলনীয়। জেল-যুলুম, ফাঁসি, সম্পত্তি বাযেয়াফত, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, আন্দামান ও কালাপানির লোমহর্ষক নির্যাতন সত্ত্বেও ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ মুজাহিদগণ শতবর্ষব্যাপী জিহাদ আন্দোলনের যে বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত রেখেছিলেন, তার খুনরাঙা পথ ধরেই উপমহাদেশে স্বাধীনতার রঙিন সূর্য উদিত হয়। অথচ দেওবন্দী ঘরানার লেখকরা মিথ্যা ইতিহাস রচনা করে তাদেরকে ইংরেজদের সেবাদাস প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা চালান অহর্নিশ। এ প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার রক্তঝরা সংগ্রামে জামা'আতে আহলেহাদীছ ও হানাফীদের ভূমিকা বিষয়ে 'তাহরীকে জিহাদ : আহলেহাদীছ আওর আহনাফ' (تحریک جہاد : اہل حدیث اور احناف) শিরোনামে উর্দূ ভাষায় একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ। এতে আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে দেওবন্দীদের বিষোদগারের তাত্ত্বিক ও দালীলিক খণ্ডন রয়েছে। সেকারণ মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর পাঠকবৃন্দের খিদমতে উক্ত অমূল্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ পত্রস্থ করা হ'ল।-সম্পাদক]

(২য় কিস্তি)

অধ্যাপক আইয়ূব কাদেরীর জওয়াবে

বলা হয়ে থাকে যে, বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও গবেষণার যুগ। আজকাল গবেষণাকর্মের বড়ই কদর। এজন্য বড় বড় প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান রয়েছে। সেখানে গবেষকগণ বিদ্যার সাগরে ডুব দিয়ে জ্ঞান-গবেষণার দামী দামী মণিমুক্তা আহরণ করে জনসমক্ষে প্রকাশ করছেন। কিন্তু তার সাথে এটাও বড় আফসোসের কথা যে, এ ধরনের অনেক গবেষণাকর্মই পক্ষপাতিত্ব, জাতীয় ও গোষ্ঠীগত ধ্যান-ধারণা এবং মানসিক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে খোলা মন ও মস্তিষ্ক নিয়ে করা হয় না। অথচ গবেষণাকর্মের জন্য এগুলিই সবচেয়ে বেশী যরূরী। অনেক সময় একজন গবেষক বিশেষ কোন পরিবেশ-পরিস্থিতি অথবা মানসিক কিংবা দলীয় সংকীর্ণতার কারণে কোন বিষয় সম্পর্কে নিজের মস্তিষ্কে একটা কাল্পনিক নকশা কিংবা ভুল ধারণা তৈরি করেন এবং তার ভিত্তিতে পড়া-লেখা না করেই পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ইতিহাস রচনা করেন। এজন্য তিনি স্বভাবত যেসব তথ্য তার মস্তিষ্ক প্রসূত ধারণা ও কাল্পনিক ইতিহাসের ভিত্তি গড়তে পারে, সেগুলি সংগ্রহ করতে থাকেন। কিন্তু যে সব বাস্তব বিষয় ও ঘটনা তার ধারণাকে ভুল প্রতিপন্ন করতে পারে সেগুলো সম্পূর্ণই তার অগোচরে রয়ে যায়। কেননা তার মস্তিষ্কে তো একটা বিশেষ ধারণা আগে থেকেই বাসা বেঁধে আছে, যা তার গবেষণাকর্মের ধারা একটি বিশেষ দিকে পরিচালিত করে। তারপর আর সত্য উদ্ঘাটন তার উদ্দেশ্য থাকে না, বরং তার মনে বাসা বাঁধা কল্পনাকে বাস্তবের রঙে রঞ্জিত করাই তার ধ্যান-জ্ঞান হয়ে দাঁড়ায়।

কিছুটা এমনই এক 'ঐতিহাসিক সৃষ্টিকর্ম' হ'ল করাচীর জনৈক অধ্যাপক জনাব মুহাম্মাদ আইয়ূব কাদেরীর একটি প্রবন্ধ, যা প্রথমে করাচীর 'আল-বালাগ' এবং পরে লাহোরের সাপ্তাহিক 'চাটান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে খুবই দুঃখজনকভাবে উপমহাদেশের আহলেহাদীছদের ইতিহাসকে বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীতে বিকৃতভাবে চিত্রায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যার মূল কথা হ'ল এই যে, স্যার সৈয়দ আহমাদের সময় থেকে জামা'আতে আহলেহাদীছ তাদের কার্যধারা বদলে ফেলে এবং ইংরেজদের সহযোগিতা ও আনুগত্যকে তাদের নীতি হিসাবে গ্রহণ করে।[২] একই সাথে আরেকটি অপবাদ আরোপ করা হয় যে, ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে এই জামা'আত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। অথচ এই দু'টি অভিযোগই সর্বৈব মিথ্যা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সংকীর্ণতা ও দলীয় গোঁড়ামির নিরেট বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সে কথা আমরা প্রথমেই বলে এসেছি। কোন মানুষ ইলমী আমানতদারী ও ঘটনাবলী বিশ্লেষণের সর্বজনগ্রাহ্য নীতিমালা পিছনে ছুঁড়ে ফেলে ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত না হ'লে উক্ত অপবাদ দু'টি সাব্যস্ত করা আদৌ সম্ভব হ'তে পারে না। ফলত অধ্যাপক ছাহেবের প্রবন্ধে ইতিহাস রচনার এই মন্দ রীতিই অনুসৃত হয়েছে।

প্রথমত আমরা প্রবন্ধকারের বুদ্ধিবৃত্তিক সংকীর্ণতা স্পষ্ট ও পরিষ্কার করা আবশ্যক মনে করছি। কেননা তাঁর ঐ গবেষণার পিছনে এই সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামিই কাজ করেছে। লেখক নিজে দেওবন্দী চিন্তাধারার সাথে যুক্ত এবং দেওবন্দী আলেমদের সাথে হৃদয়ের সম্পর্ক রাখেন। যে কারণে আহলেহাদীছ জামা'আত ও আহলেহাদীছ আলেমদের সাথে দুশমনী রাখতে স্বভাবতই তিনি বাধ্য। সম্ভবতঃ এটিও দেওবন্দী চিন্তাধারার একটি অংশ।

তার বিরোধিতামূলক লেখার দ্বিতীয় সুস্পষ্ট প্রমাণ তার এই গবেষণা যে, স্যার সৈয়দ আহমাদ শুধু আহলেহাদীছই ছিলেন না; বরং কট্টর আহলেহাদীছ ছিলেন। আর এই মত কেবল তিনিই পোষণ করতে পারেন, যার মগযে আহলেহাদীছ বিরোধিতার আবেগ ক্রিয়াশীল। তা না হ'লে এ সত্য কার অজানা যে, আহলেহাদীছ ও স্যার সৈয়দ আহমাদের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের মতই দূরত্ব বিদ্যমান। উভয়কে এক প্রমাণ করা আগুন ও পানিকে একত্রিত করার নামান্তর। আহলেহাদীছ কুরআন ও সুন্নাহ্র নির্ভেজাল সালাফী পথের অনুসারী। তার থেকে এক চুলও পিছপা হ'তে তারা রাযী নয়। এজন্য দেওবন্দ আলেমগণ আজকাল আহলেহাদীছ

** পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শারঈ আদালতের আজীবন উপদেষ্টা, প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম, লেখক ও গবেষক; সাবেক সম্পাদক, সাপ্তাহিক আল-ই'তিছাম, লাহোর, পাকিস্তান। জন্ম : ১৯৪৫ জয়পুর, রাজস্থান, ভারত; মৃত্যু : ১২ই জুলাই ২০২০ লাহোর, পাকিস্তান।*

*** ঝিনাইদহ।*

২. স্যার সৈয়দ আহমাদ খান (১৮১৭-১৮৯৮ খৃ.) হলেন আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এর মাধ্যমে মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেন ও ইংরেজদের সাথে আপোষনীতি গ্রহণ করেন। ইংরেজ সরকার খুশী হয়ে তাঁকে 'স্যার' উপাধি দেয়।

আলেমদেরকে 'বাহ্যদর্শী' (যারা কোন জিনিসকে উপর উপর বোঝে, গভীরভাবে তলিয়ে দেখে না বা বুঝতে চেষ্টা করে না) বলে বিদ্রুপ করে থাকেন। আহলেহাদীছ আলেমগণ উক্ত বিদ্রুপকে এই ভেবে মেনে নেন যে, যদিও আমরা এভাবে তিরস্কারের পাত্র হচ্ছি, তবুও কুরআন ও হাদীছ তো বাচ্চাদের খেলনা হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যাচ্ছে। এর বিপরীতে স্যার সৈয়দ কুরআন ও হাদীছের এমন সব নাযুক ও দুর্বল অর্থ করেছেন, যা কোন বাহ্যদর্শীর কাজ হ'তে পারে না। সেটা তো দেওবন্দী আলেমদের মতো কোন ডুবুরীর কাজ হ'তে পারে, যারা কি-না প্রকাশ্য অর্থকে যথেষ্ট মনে করেন না; বরং তার মগয বের করে ছাড়েন। তারপরও উল্টো দাবী যে, স্যার সৈয়দ 'আহলেহাদীছ' ছিলেন!

যদি কেউ শুধু মুখে বলে যে, 'আমি আহলেহাদীছ' 'আমি হানাফী' ব্যস অমনি সে আহলেহাদীছ ও হানাফী হয়ে গেল? তারপর তার ঈমান-আক্বীদা ও তার সারা জীবনের কার্যধারার মাঝে কি এটা তলিয়ে দেখা যরূরী নয় যে, তার মৌখিক দাবী ও বাস্তব আমলের মধ্যে কোন মিল আছে কি-না? সম্মানিত প্রবন্ধকারের নিকট আমাদের আরয, মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীও নিজেকে 'হানাফী' দাবী করতেন। তারই সমনামের ও সমবয়সের গোলাম আহমাদ পারভেযও নিজের হানাফী হওয়ার ডঙ্কা বাজাতেন। এ দাবী বিশ্বাসযোগ্যও। তাহ'লে কি জনাবের বর্ণনাকৃত মূলনীতি অনুযায়ী কাদিয়ানী ও পারভেযীদেরকে হানাফীদের একটা উপদল বলা যাবে? মোটকথা, আমরা এটা বলতে চাচ্ছি যে, স্যার সৈয়দ আহমাদকে আহলেহাদীছ বানানোর অপচেষ্টা প্রবন্ধকারের বুদ্ধিবৃত্তিক গোঁড়ামির দলীল মাত্র।

তাছাড়াও পুরো লেখার প্রতিটি অংশ এ কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, প্রবন্ধকার আমানতদারী ও নিরপেক্ষতার পরিবর্তে নির্ভেজাল সংকীর্ণতা ও পক্ষপাতিত্বের সাথে কাজ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ আজকাল দেশ জুড়ে যে বিপজ্জনক রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার ঘটছে, তাতে হকপন্থী দলগুলোর যেখানে একত্রে মিলেমিশে কাজ করা আবশ্যক, সেখানে হকপন্থী একটি দলের বিরুদ্ধে এভাবে কষ্টদায়ক রচনা হকপন্থীদেরই আরেকটি দলের পক্ষ থেকে কেন প্রকাশ করা হচ্ছে তা আমাদের বোধগম্য নয়। কিছু সময়ের জন্য যদি মেনে নেওয়া হয় যে, এই অভিযোগ সঠিক এবং আহলেহাদীছরা সত্যিই ইংরেজদের অনুগত ছিল, তবুও তো এখন যখন তারা অন্য সব ইসলামী দলের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে, তখন এ ধরনের গবেষণার উদ্দেশ্য কী? আহলেহাদীছ জামা'আতের এমন কী অপরাধ যে, এই নাযুক পরিস্থিতিতেও আমাদের এই মেহেরবান লেখক তা মাফ করতে প্রস্তুত নন? আমাদের অপরাধ কি এমনই যে, যার প্রতি এক আরব কবি ইশারা করেছেন,

وُجُوْدُكَ ذَنْبٌ لَا يُقَاسُ بِهِ ذَنْبٌ

'তোমার অস্তিত্বই তোমার অপরাধ।
তার চেয়ে বড় কোন অপরাধ আর নেই'।

তৃতীয়তঃ এই প্রবন্ধ 'চাটান' পত্রিকায় প্রকাশ আরও বেশী আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর। এ পত্রিকার সম্পাদক মুহতারাম আগা শূরেশ কাশ্মীরী যিনি নিজেও ইংরেজ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে লড়াইকারী, এ পথে পদচারণার ফলে পায়ে ফোস্কা ফেলে আহত-যখম ব্যক্তি, আযাদী কাফেলার অবশিষ্টদের একজন, যার সামনে আহলেহাদীছ জামা'আতের জিহাদ ও সংগ্রামের পুরো নকশা মওজূদ আছে। এর বিস্তারিত ইতিহাস সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন এবং জামা'আতের খেদমতকে যিনি স্বীকার করেন। তিনি তো আজ থেকে তিন বছর আগে লাহোরে আহলেহাদীছদের এক মহাসম্মেলনে আহলেহাদীছ জামা'আত সম্পর্কে বলেছিলেন যে, হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা যুদ্ধে সবচেয়ে বেশী রক্ত এই জামা'আতের লোকদের ঝরেছে। সেই বক্তৃতার কিছু নির্বাচিত অংশ 'চাটান' পত্রিকাতেও ছাপা হয়েছিল। আগা ছাহেব সেদিন বলেছিলেন, '১৮৫৭ সালে দিল্লী যখন মৃত্যুপুরী, রাষ্ট্রক্ষমতা মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের জন্য হিন্দুস্তানের মাটি সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল, তখন যে জামা'আতকে সবচেয়ে বেশী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের চুলার জ্বালানী হ'তে হয়েছিল, যাদের আলেমদের নামে অসংখ্য মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছিল, তারা হ'লেন আহলেহাদীছ। মামলা-মোকদ্দমার এই সিলসিলা ঊনিশ শতকের শেষ আট ও নয় দশক পর্যন্ত জারী ছিল। তখন হিন্দুস্তানের বধ্যভূমিতে যারা জীবন দিয়েছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল পৌনে দুই লাখ। এই গণহত্যার কথা যোর-যবরদস্তি করে ভুলিয়ে দেওয়ার কারণে তাদের ব্যক্তিগত নামসমূহ আজ আর সংরক্ষিত নেই। কিন্তু তাদের জামা'আতের নাম থেকে গেছে। এখন যে রেকর্ড সামনে আসছে তাতে এ কথার সত্যতা মেলে যে, তাদের রক্তের উপর যে নামের ছাপ লাগানো হয়েছিল তা ছিল 'ওহাবী'। এ এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে, সবচেয়ে বড় সংস্কারবাদী এই জামা'আত এবং তাদের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নেতৃবৃন্দকে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকবৃন্দ ও তাদের এ দেশীয় নব্য দোসররা নানা মিথ্যা অভিযোগ ও অপবাদের লক্ষ্যে পরিণত করে ইসলামের শক্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিল এবং ইসলামের মূলতত্ত্ব বা পরিচয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছিল। নতুবা একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে হিন্দুস্তানে ইসলামের ইতিহাস এই ওহাবী জামা'আতের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। আমি আহলেহাদীছকে এই হিসাবে স্বীকার করি এবং আমার অবাক লাগে যে, এমন এক একটা মুক্তার দানাও মুসলমানদের মধ্যে ছিল- যারা দ্বীনকে পরিশুদ্ধ করেছেন, কিন্তু নিজেরা অপমানিত হয়েছেন; যারা ইসলামকে উঁচু করেছেন, কিন্তু নিজেরা গযবের শিকার হয়েছেন; যারা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের কঠোর মোকাবেলা করেছেন, কিন্তু নিজেরা দেশী-বিদেশীদের খঞ্জরে ঘায়েল হয়েছেন' *(সাপ্তাহিক 'চাটান' ১৩ই নভেম্বর ১৯৬৭)*।

আহলেহাদীছ জামা'আতের প্রতি আগা ছাহেবের এমন সুধারণা এবং তাদের খেদমত স্বীকার করার পরও অধ্যাপক কাদেরীর প্রবন্ধ 'চাটান' পত্রিকায় প্রকাশে আমরা বিস্মিত হয়েছি। কেননা এ প্রবন্ধে আগা ছাহেবের ধারণার বিপরীত ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে। সম্ভবত গবেষণা ও সমালোচনার

উদ্দেশ্যে তিনি তা ছেপেছেন, যাতে ইতিহাসের চাপা পড়া একটি দিক মানুষের সামনে উন্মোচিত হ'তে পারে। এজন্যই আগা ছাহেব তার মন্তব্যে এ বিষয়ে গবেষণার জন্য উন্মুক্ত আহ্বান জানিয়েছেন। এ আহ্বানকে স্বাগত জানিয়ে আমরা কিছু নিবেদন পেশ করছি।

স্যার সৈয়দ আহমাদ খানের যে চিন্তাধারা ছিল তা অধ্যাপক আইয়ূব কাদেরীর ভাষাতেই শুনুন। তিনি লিখেছেন,

'চিন্তা-ভাবনার পর স্যার সৈয়দ আহমাদ খান এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইংরেজদের স্থায়ী ও স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, মুসলমানদের এখন ইংরেজদের সাথে মিলেমিশে থাকা এবং শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ জীবন যাপন করা উচিত। শাসক ও শাসিতের মধ্যকার ভুল বুঝাবুঝির অবসান হওয়া আবশ্যক। আর কিছুদিনের জন্য মুসলমানদের রাজনীতি থেকে একেবারেই দূরে থাকতে হবে এবং সরকারের মনে নিজেদের আনুগত্যের পুরো ছবি বসিয়ে দিতে হবে। যাতে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের মন্দ ধারণা দূর হয়ে যায়। সেই সাথে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দিকেও মুসলমানদের দৃষ্টি দিতে হবে'।

অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের পর মুসলমানদের সীমাহীন দুরবস্থায় ব্যথিত স্যার সৈয়দ চাইছিলেন যে, মুসলমানরা ইংরেজদের সঙ্গে শত্রুতা না করে বরং মিত্রতা ও সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করুক।

এখন তার এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার বিষয় এই যে, সমস্ত মুসলমানের মধ্যে প্রকৃত অর্থে যে জামা'আত ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক মনোভাব পোষণ করছিল এবং সেজন্য বাস্তবে যথাসাধ্য ত্যাগ স্বীকার করছিল, সে জামা'আতের নাম আহলেহাদীছ। (যার স্বীকৃতি কাদেরী ছাহেবও দিয়েছেন।) তাদেরকেই 'জামা'আতে মুজাহিদীন' বলা হ'ত এবং তারাই 'ওহাবী' নামে কথিত হ'ত। এ কারণেই ইংরেজদের অত্যাচার-নিপীড়ন ও যোর-যুলুমের শিকার প্রায়শ এই জামা'আতকেই হ'তে হয়েছে। ১৮৬৪ থেকে ১৮৮১ খৃ. পর্যন্ত ওহাবী মোকদ্দমা সমূহের রোয়েদাদ আমাদের এ কথার সাক্ষ্য বহন করে।[৩] এদিকে উইলিয়াম হান্টারও (১৮৭২ সালে) ওহাবীদের বিরুদ্ধে গরম গরম রিপোর্ট দেন। তিনি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দায় কেবল 'ওহাবী-আহলেহাদীছদের' উপরেই চাপান। তার এই রিপোর্ট গরম কড়াইয়ে ফুটন্ত তেলের কাজ করে এবং ইংরেজ সরকারের রাষ্ট্রযন্ত্র এই জামা'আতকে নিশ্চিহ্ন করতে উঠে-পড়ে লাগে।

এ ছিল সেই পটভূমি, যার প্রেক্ষিতে স্যার সৈয়দ আহমাদ ওহাবীদের রক্ষার্থে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন, 'আমি একজন ওহাবী, আমার আক্বীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমি ইংরেজ শাসনের অনুগত এবং কোন ওহাবী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে না'।

স্যার সৈয়দ মরহূমের এ ঘোষণা প্রকৃতপক্ষে তার সেই মনোবেদনার বহিঃপ্রকাশ। যার প্রেক্ষিতে তিনি 'আসবাবে বাগাওয়াতে হিন্দ' বা 'হিন্দুস্তানে বিদ্রোহের কারণ' নামক বই রচনা করেছিলেন এবং মুসলিম জাতিকে কোন না কোনভাবে রক্ষা করার চিন্তা করেছিলেন। এ থেকে এ সিদ্ধান্তে কিভাবে উপনীত হওয়া যায় যে, স্যার সৈয়দ আহমাদ 'আহলেহাদীছ' ছিলেন? যার উপর ভিত্তি করে মুহতারাম কাদেরী ছাহেব নিজ প্রবন্ধের পুরো সৌধ নির্মাণ করলেন? যে হানাফীদের হান্টার ছাহেব ওহাবীদের বিপরীতে 'সুন্নী' নামে আখ্যায়িত করেছেন, তারা যদি বিদ্রোহের জোশের আগুনে জ্বলতো তাহ'লে নিশ্চয়ই স্যার সৈয়দ নিজেকে 'হানাফী' ঘোষণা দিয়ে তাদের রক্ষার্থে ঐ একই কথা বলতেন। কিন্তু সুন্নীরা তো সে সময় সন্দেহ বশে ধরপাকড়ের ভয়ে হিজাযের পথে পা বাড়িয়েছিল অথবা জুব্বা-জামা নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ব্যস্ত ছিল, কিংবা হত-দুর্বল ওহাবীদের মসজিদ থেকে বের করে দেওয়ার ফৎওয়া দিতে ব্যস্ত ছিল। ঘটনা তো অনেক লম্বা! কবি বলেন,

ہمیں یاد ہے سب ذرا ذرا + تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو

'আমাদের তো সব মনে আছে কম কম। তোমাদের তা স্মরণ আছে, কিংবা স্মরণ নেই'।

উক্ত দু'লাইন হঠাৎই কলমের ডগায় এসে গেল। নতুবা আমাদের হৃদয়ে তো সকল বুযুর্গের প্রতি অঢেল সম্মান রয়েছে। আল্লাহ বলেন, تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ– 'তারা এক উম্মাহ, যারা বিগত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে তার বিনিময় তারা পাবে, আর তোমরা যা করছ তার বিনিময় তোমরা পাবে। তারা যা করত সেজন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/১৩৪)*।

কাদেরী ছাহেবের প্রবন্ধের ভুল-ভ্রান্তি : এই প্রবন্ধে কাদেরী ছাহেব আরও লিখেছেন, 'হিন্দুস্তানের মুসলমানরা অধিকাংশ হানাফী মাযহাবের অনুসারী। বিশিষ্টজন ও আলেমদের মধ্যে কিছু আহলেহাদীছও রয়েছেন। মৌলভী ইসমাঈল শহীদ এই আহলেহাদীছ চিন্তাধারার প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন এবং এজন্য নিজ অনুসারীদের একটি দল প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য মুজাহিদ বাহিনীতে আহলেহাদীছ ও হানাফী উভয় শ্রেণীর লোক মওজুদ ছিল। সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী (রহঃ)-এর খেয়াল তো স্পষ্টই হানাফী মাযহাবের প্রতি ছিল। মাওলানা বেলায়েত আলী ছাদেকপুরীর মাযহাবও হানাফী ছিল। মাওলানা বেলায়েত আলী এক স্থানে বলেছিলেন, 'আমি হানাফী মাযহাবের অনুসারী। আর এ মাসআলা সর্বসম্মত যে, যদি কোন হানাফী সুস্পষ্ট এবং অরহিত (حديث صريح غير منسوخ) কোন হাদীছ পেয়ে কোন ফিক্বহী মাসআলার বিপরীতে আমল করে, তবে হানাফী মাযহাব থেকে সে খারিজ হবে না'। এই পুরো উদ্ধৃতি তার প্রবন্ধটির ভুল হওয়ার আয়না স্বরূপ বলা চলে।

প্রথমতঃ এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, শাহ ইসমাঈল শহীদ

৩. *ঐ, মামলা সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাওলানা মাসঊদ আলম নাদভী তাঁর 'হিন্দুস্তান কী পহেলী ইসলাম তাহরীক' বইয়ে সন্নিবেশিত করেছেন। যদিও এর সবিস্তার আলোচনার বিষয়টি এখনো চিন্তাশীল ঐতিহাসিকদের অপেক্ষায় রয়েছে।*

মুজাহিদ বাহিনীতে আহলেহাদীছ চিন্তাধারার বিশেষ প্রসার ঘটিয়েছেন। অন্য কথায়, শাহ ইসমাঈল শহীদ মুজাহিদ বাহিনীতে যেখানে হানাফী ও আহলেহাদীছ উভয় শ্রেণীর লোক ছিলেন, তাদের মাঝে ফিক্বহী ও দলীয় গোঁড়ামির গোড়াপত্তন করেন। অথচ এ কথা সম্পূর্ণ বাস্তবতা বিবর্জিত। শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) অবশ্যই আহলেহাদীছ ছিলেন, কিন্তু ফিক্বহী মাসআলা সমূহের পিছনে প্রবন্ধকারের ইঙ্গিত মতো তিনি তাঁর যোগ্যতা ও সামর্থ্য কখনও ব্যয় করেননি। তাঁর লক্ষ্য বেশীর ভাগ ছিল শিরক-বিদ'আত মিশ্রিত বিশ্বাস, অনৈসলামী ও জাহেলী রসম-রেওয়াজ উৎখাত এবং আক্বীদা-বিশ্বাস সংশোধনে কেন্দ্রীভূত। তাঁর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল এই মিশনকে বাঁচিয়ে রাখা, যা তিনি সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী (রহঃ)-এর নেতৃত্বাধীনে শুরু করেছিলেন। আহলেহাদীছদের যেসব মাসআলা 'ব্রাদারানে ইউসুফ'-এর (হিংসুটেদের) মেহেরবানীতে আমাদেরকে একটা পৃথক মাসআলাধারী সমাজ বানিয়ে দিয়েছে, তাকে মাওলানা শহীদ না তার গবেষণার বিষয় বানিয়েছিলেন, না মুজাহিদ বাহিনীতে তিনি বিশেষভাবে তার প্রচার-প্রসার ঘটিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি দাবী করেছেন যে, মুজাহিদ বাহিনীর নেতৃত্ব সাধারণত হানাফীদের হাতে ছিল। এ কারণেই উপরের উদ্ধৃতিতে তিনি সাইয়েদ আহমাদ শহীদের সাথে মাওলানা বেলায়েত আলীর মতো হাদীছের উপর আমলকারী বিখ্যাত ব্যক্তিত্বকেও হানাফী মতের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। অথচ বাস্তব সত্য এই যে, মুজাহিদ বাহিনীর নেতৃত্ব আগাগোড়াই বেশীর ভাগ সময় ও ক্ষেত্রে আহলেহাদীছ মান্যবরদের হাতেই ছিল। খোদ এই প্রবন্ধ থেকেও এ কথা সাব্যস্ত হয় যে, আহলেহাদীছরাই এই বাহিনীর মূলধন ও প্রাণ স্পন্দন ছিল। ইতিপূর্বে আমরা সে কথার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি। তাছাড়াও যেসব বিশিষ্ট হানাফী এই বাহিনীতে শামিল ছিলেন তারাও অলিউল্লাহী চিন্তাধারার সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। যদিও তারা হানাফী ফিক্বহের উপর আমল করতেন, তবুও সেই অন্ধ তাক্বলীদ থেকে তারা পুরোপুরি মুক্ত ছিলেন, যে তাক্বলীদের উপর দেওবন্দী আলেমগণ বিশেষভাবে আমল করে আসছেন। তাদের হানাফিয়াতের মাঝে হাদীছের উপর আমলের আগ্রহ প্রতিনিয়ত বাড়ছিল। ফলে এই বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের এ ধরনের হানাফীদের নিয়ে কোন সমস্যা ছিল না। ফলশ্রুতিতে এই নির্মল পরিচ্ছন্ন জামা'আত আমে-দুধে মিশে জনগণের আক্বীদা সংস্কারে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

কবির ভাষায়, خدا رحمت کند ایں عاشقاں پاک طینت را 'এই পবিত্র স্বভাবের প্রেমিকদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করুন'।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হযরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহঃ) হানাফী ছিলেন। কিন্তু ছিরাতুল মুস্তাক্বীম তথা সরল পথের এই পথিক জ্ঞানীদের জন্য চোখের সুর্মা সম ছিলেন। জানা প্রয়োজন যে, 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম' সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহঃ)-এর বাণীসমূহের সংকলন। তাতে তিনি বলেছেন, 'প্রচলিত চার মাযহাবের অনুসরণ সাধারণভাবে ঠিক আছে। কিন্তু নববী ইলমকে একজন মুজতাহিদের মাঝে সীমাবদ্ধ ভাবা ঠিক হবে না। কেননা সে সময় গ্রন্থাকারে সংকলিত না থাকার কারণে নববী ইলম তথা হাদীছ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। প্রত্যেক মুজতাহিদ স্বীয় সময়ের প্রয়োজন মাফিক তা থেকে হিস্যা লাভ করেছেন। তারপর যখন হাদীছের গ্রন্থগুলো লিখিতভাবে আত্মপ্রকাশ করল, তখন তাতে সকল নববী ইলমের একত্র সমাবেশ ঘটল। তাই এখন যে মাসআলাতেই স্পষ্ট এবং অরহিত ছহীহ হাদীছ (حدیث صحیح صریح غیر منسوخ) মিলবে, সেই মাসআলাতে হাদীছের খেলাফ কোন মুজতাহিদেরই অনুসরণ করা যাবে না। এক্ষেত্রে আহলেহাদীছ মুহাদ্দিছগণকে অনুসরণ করতে হবে। তাঁদের সাথে মহব্বত রাখা এবং তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যরূরী হবে। তাঁরাই তো নববী ইলমের বাহক। ফলে নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে তাঁদের এক ধরনের সংযোগ ও ছোহবত থাকায় তাঁর নিকটে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত হয়েছে'।[৪] নীতিগতভাবে আহলেহাদীছদের বক্তব্য এটাই। এ মতের ধারক-বাহকদের হানাফী বলা চলে না।

তৃতীয়তঃ এ দাবীও বড়ই হাস্যকর যে, 'মাওলানা বেলায়েত আলী এবং তার সঙ্গী-সাথী ও ছাত্ররা সবাই হানাফী ছিলেন'। তাদের হানাফী বলে দাবী করার পিছনে কারণ এই যে, সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ও শাহ ইসমাঈল শহীদের শাহাদতের পর জিহাদ আন্দোলনের পুরো নেতৃত্ব মাওলানা বেলায়েত আলী, তার ভাই মাওলানা এনায়েত আলী এবং পর্যায়ক্রমে তাদের ছাত্রবৃন্দ, বন্ধু-বান্ধব ও তাদের খান্দানের বিভিন্ন সদস্যের হাতে ছিল। তাদের নেতৃত্ব ভিত্তিক কার্যাবলী, জিহাদী তৎপরতা এবং এ পথে তাদের কঠিন কষ্ট ও ত্যাগের কথা মাওলানা মাসঊদ আলম নদভী তার 'হিন্দুস্তান কী পহেলী ইসলামী তাহরীক' বইয়ে দরদভরা হৃদয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। এতদসঙ্গে 'তাযকেরায়ে ছাদেক্বাহ' গ্রন্থও পাঠযোগ্য। এখন যদি তাদের হানাফী সাব্যস্ত করা যায়, তাহ'লে সহজেই প্রমাণিত হবে যে, দুই শহীদের শাহাদতের পর জিহাদ আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হানাফীদের (দেওবন্দীদের) হাতে এসে গিয়েছিল। এটাই সম্মানিত প্রবন্ধকারের উদ্দেশ্য বলে বুঝা যায়।

অথচ এই দু'টি দাবীই অসত্য। না মাওলানা বেলায়েত আলী এবং তাঁর ছাত্রবৃন্দ, বন্ধু-বান্ধব ও তাঁর খান্দানের সদস্যরা হানাফী ফিক্বহের মুক্বাল্লিদ ছিলেন; না দেওবন্দী আলেমগণ কোন পর্যায়ে জিহাদ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

এ স্থানে আমরা মাওলানা বেলায়েত আলীর মাসলাক বা নীতি-আদর্শের উপর কিছুটা আলোকপাত করা সমীচীন মনে করছি। যাতে এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ভুল বুঝাবুঝি থেকে ফায়েদা উঠিয়ে জিহাদ আন্দোলনের বাহবা তার সঙ্গে যারা জড়িত নয় তাদেরকে প্রদান এবং প্রকৃত অংশগ্রহণকারীদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করার চোরা পথ বন্ধ হয়ে যায়। *[ক্রমশঃ]*

৪. *ছিরাতে মুস্তাক্বীম, পৃ. ৭৮।*

যিলহজ্জ মাসের ফযীলত ও আমল

*-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ**

আল্লাহ তা'আলা কিছু মাস, দিন ও রাতকে ফযীলতপূর্ণ করেছেন। যেমন রামাযান মাসকে অন্য সকল মাসের উপর মহিমান্বিত করেছেন। আরাফাতের দিন ও ঈদের দিনকে অন্য দিনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। ক্বদরের রাতকে অন্যান্য রাতের চেয়ে মর্যাদামণ্ডিত করেছেন। আসন্ন যিলহজ্জ মাস অনুরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক মাস। যে মাসে হজ্জ ও কুরবানী করা হয়ে থাকে। এই মাসের ফযীলত ও আমল সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বিস্তর আলোচনা এসেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে যিলহজ্জ মাসের ফযীলত ও আমল সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা পেশ করা হ'ল।-

যিলহজ্জ মাসের ফযীলত : উম্মতে মুহাম্মাদীর বয়স ষাট থেকে সত্তর বছর। এথেকে অধিক বয়স কম লোকেরই হয়।[১] তাই অল্প সময়ে অধিক নেকী উপার্জনের জন্য মহান আল্লাহ বিভিন্ন মাস ও দিবসকে ফযীলতপূর্ণ করেছেন। অনুরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস হচ্ছে যিলহজ্জ মাস। এ মাসেরও অনেক ফযীলত রয়েছে।

১. এটা হারাম মাস : চারটি হারাম তথা সম্মানিত মাসের মধ্যে অন্যতম হ'ল যিলহজ্জ মাস। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، 'নিশ্চয়ই মাসসমূহের গণনা আল্লাহ্র কাছে বার মাস আল্লাহ্র কিতাবে, (সেদিন থেকে) যেদিন তিনি আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্য থেকে চারটি মাস হচ্ছে সম্মানিত। এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন' *(তওবা ৯/৩৬)*।

আবূ বাকরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، 'আল্লাহ যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন হ'তে সময় যেভাবে আবর্তিত হচ্ছিল আজও তা সেভাবে আবর্তিত হচ্ছে। বারো মাসে এক বছর। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। যুল-কা'দাহ, যুল-হিজ্জাহ ও মুহাররাম। তিনটি মাস পর পর রয়েছে। আর একটি মাস হ'ল রজব-ই মুযার,[২] যা জুমাদা ও শা'বান মাসের মাঝে অবস্থিত'।[৩]

২. এটা হজ্জের মাস : ওমরার জন্য সারা বছর সুযোগ থাকলেও হজ্জের জন্য শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত মাস রয়েছে। হজ্জের মাস সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، 'হজ্জ হয় সুবিদিত মাসগুলিতে। তারপর যে কেউ এ মাসগুলিতে হজ্জ করা স্থির করে সে হজ্জের সময় স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ করবে না' *(বাক্বারাহ ২/১৯৭)*। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, হজ্জের সুবিদিত মাসগুলি হ'ল শাওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহজ্জ। আল্লাহ এ মাসগুলি হজ্জের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আর ওমরা সারা বছর আদায় করা যায়। এ মাসগুলি ব্যতীত হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধলে হজ্জ হবে না।[৪]

৩. এটা কুরবানীর মাস : কুরবানীর একমাত্র মাস হ'ল যিলহজ্জ মাস। এই মাসের ১০ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত মোট চারদিন কুরবানী করার সময়। প্রথম দিন তথা ১০ই যিলহজ্জ ছালাতুল ঈদের পর কুরবানী করতে হবে। ঈদের ছালাতের আগে কুরবানী করলে কুরবানী হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ. 'যে ব্যক্তি ছালাতের পূর্বে যবহ করেছে, সে যেন তদস্থলে আরেকটি যবহ করে নেয়। আর যে ব্যক্তি আমাদের ছালাত আদায় করা পর্যন্ত যবহ করেনি, সে যেন এখন আল্লাহ্র নাম নিয়ে যবহ করে'।[৫]

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের ফযীলত :

যিলহজ্জ মাস পুরোটাই ফযীলতপূর্ণ হ'লেও প্রথম দশ দিনের বিশেষ ফযীলত রয়েছে। যেমন-

এক. আল্লাহ এই দিনগুলির কসম করেছেন : মহান আল্লাহ কুরআনে বিভিন্ন বিষয়ের কসম করেছেন। যিলহজ্জ মাসের দশ দিনের কসম করে আল্লাহ বলেন, وَالْفَجْرِ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ 'শপথ ফজরের, শপথ দশ রাত্রির, শপথ জোড় ও বেজোড়ের' *(ফজর ৮৯/১-৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْعَشْرَ عَشْرُ الأَضْحَى وَالْوِتْرَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشَّفْعَ يَوْمُ النَّحْرِ، 'দশম হ'ল ঈদুল আযহার দিন, বেজোড় হ'ল আরাফার দিন আর জোড় হ'ল কুরবানী দিন'।[৬]

দুই. বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন : জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَفْضَلُ

** সহকারী শিক্ষক, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, খিলগাঁও, ঢাকা।*

১. তিরমিযী হা/৩৫৫০; ইবনু মাজাহ হা/৪২৩৬; ছহীহুল জামে' হা/৪০৭৪।
২. আরবের মুযার সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা রজব মাসকে অধিক সম্মান করত। তাই এ মাসটিকে তাদের দিকে সম্বন্ধিত করে হাদীছে 'রজবে-মুযার' বলা হয়েছে।
৩. বুখারী হা/৩১৯৭; মুসলিম হা/১৬৭৯; আবুদাউদহা/১৯৪৭।
৪. তাফসীরে তাবারী, সূরা বাক্বারাহ ১৯৭ নং আয়াতে তাফসীর দ্রঃ।
৫. বুখারী হা/৫৫০০; নাসাঈ হা/৪৪১০।
৬. আহমাদ হা/১৪৫০২; বাযযার হা/২২৮৬। হাকিম হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। শু'আইব আরনাঊত এটিকে ছহীহ বলেছেন। দ্র. আহমাদ হা/১৪৫১১; আলবানী (রহঃ) একে যঈফ বলেছেন। দ্র. যঈফুল জামে' হা/১৫০৮।

أَيَّامُ الدُّنْيَا أَيَّامُ الْعَشْرِ، 'দুনিয়ার দিন সমূহের মধ্যে যিলহজ্জের প্রথম দশদিন সর্বোত্তম দিন'।[৭]

তিন. এই দিনগুলির আমল আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে প্রিয় : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا الْعَمَلُ فِى أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِى هَذِهِ. قَالُوا وَلاَ الْجِهَادُ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَىْءٍ- 'এমন কোন দিন নেই যে দিনসমূহের নেক আমল আল্লাহ্র নিকট যিলহজ্জ মাসের এই দশ দিনের নেক আমল অপেক্ষা বেশি প্রিয়। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ্র পথে জিহাদ করাও কি নয়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, জিহাদও নয়। তবে জান-মাল নিয়ে যদি কোন লোক জিহাদে বের হয় এবং এ দু'টির কোনটি নিয়েই আর ফিরে না আসে তার কথা ভিন্ন।[৮] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ عَمَلٍ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ أَعْظَمَ أَجْراً مِنْ خَيْرٍ يَعْمَلُهُ فِى عَشْرِ الأَضْحَى- 'যেসব আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও সর্বোত্তম মর্যাদা লাভ করা যায় যিলহজ্জ মাসের দশদিনের আমল তার অনুরূপ'।[৯]

চার. এই দশ দিনে সকল মৌলিক ইবাদত একত্রিত হয় : এই দশদিন আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত প্রায় সকল ইবাদত একত্রিত হয়, যা অন্য কোন সময়ে একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়। যেমন হজ্জ, কুরবানী, ছালাত, ছিয়াম, দান-ছাদাক্বাসহ সকল ইবাদত এই দশ দিন একত্রিত করা যায়। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ السَّبَبَ فِي امْتِيَازِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ لِمَكَانِ اجْتِمَاعِ أُمَّهَاتِ الْعِبَادَةِ فِيهِ وَهِيَ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْحَجُّ وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ، 'এ কথা স্পষ্ট হয় যে, যিলহজ্জের প্রথম দশ দিনের বিশেষ গুরুত্বের কারণ; যেহেতু ঐ দিনগুলিতে মৌলিক ইবাদতসমূহ একত্রিত হয়েছে। যেমন ছালাত, ছিয়াম, ছাদাক্বাহ এবং হজ্জ, যা অন্যান্য দিনগুলিতে এভাবে একত্রিত হয় না'।[১০]

পাঁচ. দ্বীনের নিদর্শনসমূহের সম্মানের সময় : এই দশ দিনে যেহেতু ইসলামের মৌলিক ইবাদত একত্রিত হয়, সেহেতু আল্লাহ্র দ্বীনের নিদর্শন সমূহও সম্মান করা সহজ হয়। মহান আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، 'এটাই হ'ল আল্লাহ্র বিধান, যে আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাক্বওয়া থেকেই' *(হজ্জ ২২/৩২)*।

আল্লাহ্র শি'আর বা নিদর্শন বলতে বুঝায় এমন প্রতিটি বিষয় যাতে আল্লাহ্র কোন নির্দেশের চিহ্ন দেয়া আছে *(কুরতুবী)*। এগুলি আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যের চিহ্ন। বিশেষ করে হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি, যেমন হজ্জের যাবতীয় কর্মকাণ্ড *(কুরতুবী; সা'দী)*। হাদীর জন্য হাজীদের সঙ্গে নেয়া উট ইত্যাদি *(ইবনে কাছীর)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এখানে আল্লাহ্র নিদর্শন সম্মান করার দ্বারা হাদীর জন্তুটি মোটাতাযা ও সুন্দর হওয়া বোঝানো হয়েছে *(ইবনে কাছীর)*।[১১]

আরাফার দিনের ফযীলত :

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হ'ল আরাফার দিন। এ দিনেরও বিশেষ ফযীলত রয়েছে।-

১. আল্লাহ্র দ্বীন ও নে'মত পরিপূর্ণ হওয়ার দিন : মহানবী (ছাঃ)-এর নবুঅতের শেষদিকে বিদায় হজ্জের সময় আরাফার দিন শুক্রবার আল্লাহ ইসলামকে পরিপূর্ণ দ্বীন হিসাবে ঘোষণা করেন। আল্লাহ বলেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*।

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনৈক ইহূদী তাঁকে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনাদের কিতাবে একটি আয়াত আছে, যা আপনারা পাঠ করে থাকেন। তা যদি আমাদের ইহূদী জাতির উপর অবতীর্ণ হ'ত, তবে অবশ্যই আমরা সে দিনকে ঈদের দিন হিসাবে পালন করতাম। তিনি বললেন, কোন আয়াত? সে বলল, 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নে'মত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*। ওমর (রাঃ) বললেন, এটি যে দিনে এবং যে স্থানে নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল তা আমরা জানি। তিনি সেদিন আরাফায় দাঁড়িয়েছিলেন আর সেটা ছিল জুম'আর দিন'।[১২]

২. কুরআন ও হাদীছকে চূড়ান্ত সংবিধান ঘোষণার দিন : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যুর অল্প কিছু দিন আগে বিদায় হজ্জের ভাষণে ক্বিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত আগত সকল মানুষের সকল সমস্যার সমাধান হিসাবে একমাত্র কুরআন ও হাদীছের কথা ঘোষণা করেন। ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি বলেন, وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللهِ. 'আমি তোমাদের মাঝে এমন একটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধরো, তবে তোমরা আমার মৃত্যুর পর

---

৭. ছহীহুল জামে' হা/১১৩৩; ছহীহুত তারগীব হা/১১৫০।
৮. বুখারী হা/৯৬৯; তিরমিযী হা/৭৫৭; মিশকাত হা/১৪৬০।
৯. ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১১৪৮; ইরওয়া ৩/৩৯৮।
১০. ফাতহুল বারী ২/৪৬০।

১১. কুরআনুল কারীম (সঊদী আরব: বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স ১৪৪০ হিঃ) ২/১৭৬৭-১৭৬৮।
১২. বুখারী হা/৪৫; মুসলিম হা/৩০১৭।

কখনো বিপথগামী হবে না, তা হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব'।[১৩]

মালিক ইবনু আনাস (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ 'আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ তোমরা সে দু'টি জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত'।[১৪]

৩. আল্লাহ এই দিনের কসম করেছেন : আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلْيَوْمُ الْمَوْعُوْدُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَالْيَوْمُ الْمَشْهُوْدُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، 'আল-ইয়াউমুল মাওঊদ' *(বুরূজ ৮৫/২)* অর্থ- ক্বিয়ামতের দিন; 'আল-ইয়াউমুল মাশ্হূদ' *(হূদ ১১/১০৩)* অর্থ আরাফাতে (উপস্থিতির) দিন এবং 'আশ্-শাহিদ' *(বুরূজ ৮৫/৩)* অর্থ- জুম'আর দিন'।[১৫] আল্লাহ বলেন, 'শপথ জোড় ও বেজোড়ের' *(ফজর ৮৯/৩)*। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বেজোড়-এর অর্থ আরাফা দিবস এবং জোড়-এর অর্থ ইয়াওমুন্নাহ্র (কুরবানী দিন)'।[১৬]

৪. আরাফাত ময়দানের সন্নিকটে আল্লাহ মানব জাতি থেকে ওয়াদা নিয়েছেন : ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আরাফার ময়দানের সন্নিকটে না'মান নামক স্থানে আদম (আঃ)-এর মেরুদণ্ড হ'তে তাঁর সন্তানদের বের করে শপথ নিয়েছিলেন। তাদেরকে পিঁপড়ার মত আদম (আঃ)-এর সামনে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের সম্মুখে কথা বলেছিলেন, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِيْنَ، أَوْ تَقُوْلُوْا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ- 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই? আদম সন্তানরা উত্তর দিয়েছিল, হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি আমাদের প্রতিপালক। এতে আমি সাক্ষী থাকলাম। যাতে তোমরা ক্বিয়ামতের দিন এ কথা বলতে না পার, আমরা জানতাম না কিংবা তোমরা এ কথাও বলতে না পার, আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ আমাদের পূর্বে মুশরিক হয়ে গিয়েছিল। আর আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর। তুমি কি বাতিলধর্মী (পিতৃ-পুরুষ)-গণ যা করেছে সে আমলের কারণে আমাদেরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে দিবে' *(আ'রাফ ৭/১৭২-১৭৩)*।[১৭]

৫. এই দিন সবচেয়ে বেশী মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয় : আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ، 'এমন কোন দিন নেই, যেদিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে আরাফার দিনের চেয়ে জাহান্নাম থেকে বেশি মুক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি সেদিন বান্দাদের খুব নিকটবর্তী হন, তাদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করে বলেন, এরা কি চায়? (অর্থাৎ তারা যা চায় আমি তাই দেব)।[১৮]

৬. এই দিন আল্লাহ ফেরেশতাদের কাছে তাঁর বান্দাদের নিয়ে গর্ব করেন : নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي مَلاَئِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ فَيَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আরাফার দিন বিকেলে আরাফায় অবস্থানকারী ব্যক্তিদের নিয়ে ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করেন। অতঃপর বলেন, তোমরা আমার বান্দাদের দিকে লক্ষ্য কর, তারা আমার কাছে এসেছে মাথায় এলোমেলো চুল নিয়ে ধুলি মলিন অবস্থায়'।[১৯]

৭. এই দিন মুসলমান (হাজী)দের ঈদ : এই মর্যাদাপূর্ণ দিন প্রত্যেক বছর মুসলমানদের মাঝে ফিরে আসে। এই দিন হাজীগণ আরাফার ময়দানে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ- 'আমাদের মুসলিম জনগণের ঈদের দিন হচ্ছে আরাফার দিন, কুরবানীর দিন ও তাশ্রীকের দিন। এ দিনগুলি হচ্ছে পানাহারের দিন'।[২০]

৮. আরাফার দো'আ সবচেয়ে উত্তম দো'আ : নবী করীম (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ. 'সকল দো'আর শ্রেষ্ঠ দো'আ হ'ল আরাফার দিনের দো'আ। আর শ্রেষ্ঠ কালিমাহ (যিকর) যা আমি পাঠ করেছি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণ পাঠ করেছেন তা হ'ল, 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহূ লা-শারীকা লাহূ লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর'। অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শারীক নেই। তাঁরই রাজত্ব। তার জন্যই সকল প্রশংসা। তিনি সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান'।[২১]

৯. এই দিনের ছিয়াম দুই বছরের গুনাহের কাফফারা : কাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে

---

১৩. মুসলিম হা/১২১৮; আবুদাঊদ হা/১৯০৫; মিশকাত হা/২৫৫৫।
১৪. মুওয়াত্ত্বা মালিক হা/১৫৯৪; মিশকাত হা/১৮৬।
১৫. তিরমিযী হা/৩৩৩৯; ছহীহুল জামে' হা/৮২০১।
১৬. আহমাদ হা/১৪৫৫১; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ফজর ৩ আয়াত।
১৭. আহমাদ হা/২৪৫১; ছহীহুল জামে' হা/১৭০১; মিশকাত হা/১২১।
১৮. মুসলিম হা/১৩৪৮; ইবনু মাজাহ ৩০১৪; ছহীহাহ হা/২৫৫১।
১৯. আহমাদ হা/৮০৩৩; ছহীহুত তারগীব হা/১১৫৩; ছহীহুল জামে' হা/১৮৬৮।
২০. আবুদাঊদ হা/২৪১৯; তিরমিযী হা/৭৭৩; নাসাঈ হা/৩০০৪।
২১. তিরমিযী হা/৩৫৮৫; ছহীহাহ হা/১৫০৩; মিশকাত হা/২৫৯৮।

আরাফা দিবসের ছিয়াম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন, صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ، 'আরাফা দিবসের ছিয়াম সম্পর্কে আল্লাহ্র কাছে আমি আশা করি যে, তা বিগত এক বছর ও আগত এক বছরের গোনাহের কাফফারা হবে'।[২২] সাহল বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,- مَنْ صَامَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ سَنَتَيْنِ مُتَتَابِعَتَيْنِ 'যে ব্যক্তি আরাফার দিন ছিয়াম রাখে তার পরপর দুই বৎসরের পাপরাশি মাফ হয়ে যায়'।[২৩]

১০. হজ্জের মূল কাজ হ'ল আরাফায় অবস্থান করা : হজ্জের অন্যতম ফরয হ'ল আরাফায় ময়দানে অবস্থান করা। সুতরাং 'যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বেই আরাফায় পৌঁছে গেল সে হজ্জ পেয়ে গেল'।[২৪] পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে আরাফায় অবস্থান করল না, তার হজ্জ বিনষ্ট হয়ে গেল'।[২৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْحَجُّ عَرَفَاتٌ الْحَجُّ عَرَفَاتٌ الْحَجُّ عَرَفَاتٌ أَيَّامُ مِنًى ثَلاَثٌ (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ) وَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، 'হজ্জ হচ্ছে আরাফায় অবস্থান, হজ্জ হচ্ছে আরাফায় অবস্থান, হজ্জ হচ্ছে আরাফায় অবস্থান। মিনার জন্য নির্ধারিত আছে তিন দিন। কোন ব্যক্তি যদি দুই দিন থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসে, তবে তার কোন গুনাহ হবে না। আর যদি কোন ব্যক্তি বিলম্ব করে, তারও কোন গুনাহ হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২০৩)*। ফজর উদয়ের পূর্বেই যে ব্যক্তি আরাফায় পৌঁছে যায়, সে হজ্জ পেয়ে গেল'।[২৬]

কুরবানীর দিনের ফযীলত :

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের শেষ দিন হ'ল ইয়ামুন নাহার বা কুরবানীর দিন। এই দিনের বিশেষ ফযীলত ও গুরুত্ব রয়েছে। যেমন-

১. এটা হজ্জের বড় দিন : ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِى الْحَجَّةِ الَّتِى حَجَّ فَقَالَ أَىُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمُ النَّحْرِ قَالَ هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (যিলহজ্জের ১০ তারিখ) নহরের দিন তিনটি জামরার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন, এটি কোন দিন? লোকেরা বলল, আজ কুরবানীর দিন। তিনি বললেন, আজ হজ্জের বড় দিন'।[২৭]

২. এটি আল্লাহ্র নিকট মহান দিন : নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ قَالَ ثَوْرٌ وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِى- 'অবশ্যই কুরবানীর দিন আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে মহান দিন। অতঃপর 'ক্বার্র'-এর দিন। ছাওর বলেন, তা কুরবানীর দ্বিতীয় দিন'।[২৮]

উল্লেখ্য যে, অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে এই দশক উত্তম নাকি রামাযানের শেষ দশক উত্তম। এই প্রশ্নের জবাবে ইবনু তায়মিয়া (৬৬১-৭২৮ হিঃ) (রহঃ) বলেন, أَيَّامُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ أَفْضَلُ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَاللَّيَالِي الْعَشْرُ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ لَيَالِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، 'যিলহজ্জের প্রথম দশকের দিনগুলি রামাযানের শেষ দশকের দিনগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর রামাযানের শেষ দশকের রাতগুলি যিলহজ্জের প্রথম দশকের রাতগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ'।[২৯]

ইবনু তাইমিয়া (রহঃ)-এর উক্তি প্রসঙ্গে ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'এ উত্তর নিয়ে যদি কোন যোগ্য ও জ্ঞানী ব্যক্তি গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাহ'লে তা সন্তোষজনক ও যথেষ্টরূপে পাবেন। যেহেতু দশ দিন ছাড়া অন্য কোন দিন নেই যার মধ্যে কৃত নেক আমল আল্লাহ্র নিকট অধিক পসন্দনীয় হ'তে পারে। তাছাড়া এতে রয়েছে আরাফার দিন, কুরবানী ও তারবিয়া (৮ই যিলহজ্জে)র দিন। পক্ষান্তরে রামাযানের শেষ দশকের রাত্রিগুলি হ'ল জাগরণের রাত্রি। যে রাত্রিগুলিতে রাসূল (ছাঃ) রাত জেগে ইবাদত করতেন। আর তাতে রয়েছে এমন একটি রাত, যা হাযার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ'।[৩০]

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের আমল :

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের আমলগুলিকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ আম বা সাধারণ ইবাদত। অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন বছরের অন্যান্য দিনের ন্যায় সকল নেক আমল করা। যেমন ছালাত, ছিয়াম, দান-ছাদাক্বাহ, তাসবীহ-তাহলীল, রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ, পাপ থেকে তওবা করা, কারো হক নষ্ট হ'লে তার কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়া ইত্যাদি। পাশাপাশি মুনকার বা নিষিদ্ধ কাজ করা থেকে বিরত থাকা।

দ্বিতীয়তঃ খাছ বা বিশেষ ইবাদত। যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের কিছু বিশেষ আমল রয়েছে। যেমন-

১. হজ্জ পালন করা : সামর্থ্যবান সকল মুসলিমের উপর হজ্জ ফরয *(আলে ইমরান ৩/৯৭)*। হজ্জ পালনের জন্য প্রস্তুতি মূলক কয়েকটি মাস থাকলেও একমাত্র হজ্জের কার্যক্রম সম্পাদন করা হয় যিলহজ্জ মাসে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لا ينبغي

২২. *মুসলিম হা/১১৬২; আবুদাঊদহা/২৪২৫; মিশকাত হা/২০৪৪।*
২৩. *ত্বাবারাণী হা/৫৭৯০; ছহীহুত তারগীব হা/১০১২।*
২৪. *তিরমিযী হা/২৯৭৫; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৮৯২।*
২৫. *তিরমিযী হা/৮৯০। ত্বাবারাণী*
২৬. *তিরমিযী হা/২৯৭৫; নাসাঈ হা/৩০৪৪; ইবনু মাজাহ হা/৩০১৫।*
২৭. *আবুদাঊদ হা/১৯৪৫; ইবনু মাজাহ হা/৩০৫৮, সনদ ছহীহ।*
২৮. *আবুদাঊদ হা/১৭৬৫; আহমাদ হা/১৯০৭৫; ইরওয়া হা/১৯৫৮।*
২৯. *মাজমূ'উল ফাতাওয়া (মদীনা: সঊদী আরব, বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স, ১৪২৫ হিঃ/২০০৪ খ্রিঃ) ২৫/২৮৭।*
৩০. *যা-দুল মা'আদ ১/৫৭।*

لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، ‘হজ্জের মাস ছাড়া কারো হজ্জের ইহরাম বাঁধা উচিত নয়’।[৩১] আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, لاَ يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلاَّ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ. فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُحَرَمَ بِالْحَجِّ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ. ‘হজ্জের মাসগুলি ছাড়া ইহরাম বাঁধা উচিত নয়। কারণ হজ্জের মাসগুলিতে ইহরাম বাঁধা হজ্জের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।[৩২] মহান আল্লাহ বলেন, الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، ‘হজ্জ হয় সুনির্দিষ্ট মাসসমূহে। অতএব এই মাসসমূহে যে হজ্জ করা স্থির করে নিল, তার জন্য হজ্জের সময় অশ্লীল ও পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়’ *(বাক্বারাহ ২/১৯৭)*।

যারা হজ্জ পালন করবেন তাদের জন্য এই মাসে নিম্নের কাজগুলি ধারাবাহিকভাবে করতে হবে।

(ক) ইহরাম বাঁধা ও ওমরা পালন : হজ্জ ও ওমরার প্রথম কাজ হ’ল সঠিক নিয়মে ইহরাম বাঁধা। বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে যে কোন হজ্জ বা ওমরাকারী যখনই মক্কায় প্রবেশ করবেন তখনই মীকাত হ’তে ইহরাম বাঁধবেন। হজ্জের মাস সমূহের মধ্যে যদি কোন মুসলিম হজ্জ করার ইচ্ছা পোষণ করেন তাহ’লে প্রথমে ওমরার জন্য ইহরাম বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করে ওমরাহ আদায় করে তামাত্তু‘ হজ্জ পালনকারীগণ হালাল হয়ে যাবেন। আর ক্বিরান হজ্জ পালনকারীগণ ইহরাম সহ থাকবেন এবং ৮ই যিলহজ্জের জন্য অপেক্ষা করবেন। এ সময় তারা কা‘বা ঘর তাওয়াফ, বায়তুল্লায় ছালাত আদায়, বেশী বেশী দো‘আ, যিকর, তাসবীহ-তাহলীল ও অন্যান্য ভাল কাজ করতে থাকবেন।

(খ) ৮ই যিলহজ্জের আমল : ৮ই যিলহজ্জ থেকেই মূলতঃ হজ্জের কার্যক্রম শুরু হয়। এই দিন তামাত্তু‘ হজ্জ পালনকারীগণ হজ্জের নিয়তে ওযূ-গোসল করে সুগন্ধি মেখে[৩৩] ইহরাম বেঁধে তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে নিজ অবাসস্থল থেকে কা‘বা ঘরের ৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। সকল হজ্জ পালনকারীগণ যোহরের পূর্বে মিনায় পৌঁছে সেখানে রাত্রি যাপন করবেন ও পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত তথা যোহর, আছর, মাগরিব ও এশা যথা সময়ে ক্বছর করে জমা না করে শুধু ফরয ছালাত আদায় করবেন।[৩৪] তবে ফজরের দুই রাক‘আত সুন্নাত, বিতর ছালাত ও সম্ভব হ’লে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করবে।[৩৫]

(গ) ৯ই যিলহজ্জের আমল : এই দিন হজ্জ পালনকারীগণ সূর্য উদয়ের পর তালবিয়া পাঠ করতে করতে মিনা থেকে ১৪.৪ কিলোমিটার দূরে আরাফা ময়দানের দিকে রওয়ানা হবেন।[৩৬] আর সেখানে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত অবস্থান করবেন এবং যোহরের সময় এক আযানে দুই ইক্বামতে যোহর ও আছর ছালাত ক্বছর ও জমা করে আদায় করবেন।[৩৭] সূর্যাস্তের পর হজ্জ পালনকারীগণ আরাফার ময়দানে মাগরিব ছালাত আদায় না করে ৯ কিলোমিটার দূরে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা হবেন ও সেখানে মাগরিব ও এশার ছালাত জমা ও ক্বছর করে আদায় করবেন এবং রাত্রি যাপন করবেন।[৩৮]

(ঘ) ১০ই যিলহজ্জের আমল : এই দিন সকালে মুদালিফায় ফজরের ছালাত আদায় করে ৫ কিলোমিটার দূরে মিনার দিকে রওয়ানা হবেন এবং বড় জামারাতে ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন।[৩৯] কঙ্কর নিক্ষেপের পর তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবেন এবং স্ত্রী সহবাস ব্যতীত প্রাথমিকভাবে হালাল হয়ে যাবেন।[৪০] তারপর কুরবানী করবেন এবং পুরুষরা মাথা মুণ্ডন করবেন। আর মহিলাগণ চুলের আগা থেকে একটু ছেটে ফেলবেন।[৪১] তারপর ফরয তাওয়াফ বা তাওয়াফে ইফাযা ও ছাফা-মারওয়ায় সাঈ করে পূর্ণ হালাল হয়ে যাবেন এবং মিনায় গিয়ে রাত্রি যাপন করবেন।[৪২]

(ঙ) ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জের আমল : এই তিন দিন হজ্জ পালনকারীগণ মিনায় অবস্থান করবেন এবং সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তিন জামারায়[৪৩] আল্লাহু আকবার বলে ৭টি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন।[৪৪]

২. ঈদের ছালাত আদায় করা : এই দশ দিনের অন্যতম আমল হ’ল ঈদুল আযহার ছালাত আদায় করা। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَىْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَىْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ.

‘রাসূল (ছাঃ) ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে যেতেন এবং সেখানে তিনি প্রথম যে কাজ করতেন তাহ’ল ছালাত আদায়। আর ছালাত শেষ করে তিনি লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন এবং তাঁরা কাতারে বসে থাকতেন। তিনি তাঁদের নছীহত করতেন, উপদেশ দিতেন এবং নির্দেশ দান করতেন। যদি তিনি কোন সেনাদল পাঠাবার ইচ্ছা করতেন,

---

৩১. তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা বাক্বারাহ ১৯৭ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।
৩২. ছহীহ ইবনু খুযাইমা হা/২৫৯৬; তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা বাক্বারাহ ১৯৭ নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।
৩৩. মুসলিম হা/১২৩২, ১২৫১।
৩৪. বুখারী হা/১০৮২-৮৩; মুসলিম হা/৬৯৪; মিশকাত হা/১৩৪৭।
৩৫. বুখারী হা/১০০০, ১১৫৯; মুসলিম হা/১৫৯৩; মিশকাত হা/১৩৪০।
৩৬. বুখারী হা/৯৭০; মুসলিম হা/১২১৮, ১২৮৪।
৩৭. বুখারী হা/১৬৬২।
৩৮. বুখারী হা/১৬৭৩; মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫, ২৬০৭।
৩৯. বুখারী হা/১৬৮৬; আবুদাঊদ হা/১৯৪০; মিশকাত হা/২৬১৩।
৪০. বুখারী হা/১৬৮৫; নাসাঈ হা/৩০৮৪; মিশকাত হা/২৬৭৫।
৪১. বুখারী হা/১৭২৭, ৪৪১০; আবুদাঊদ হা/১৯৮৪; মিশকাত হা/২৬৪৮।
৪২. আবুদাঊদ হা/১৯৭৩; মিশকাত হা/২৬৭৬।
৪৩. বুখারী হা/১৭৪৬; মুসলিম হা/১২৯৯; মিশকাত হা/২৬২০।
৪৪. বুখারী হা/১৭৪১, ১৭৫২, ১৭৫৩।

তবে তাদের আলাদা করে নিতেন। অথবা যদি কোন বিষয়ে নির্দেশ জারী করার ইচ্ছা করতেন তবে তা জারী করতেন। অতঃপর তিনি ফিরে যেতেন’।[৪৫]

উল্লেখ্য, মহিলারাও ঈদের ছালাতে পুরুষদের সাথে পর্দা সহকারে গমন করে ছালাত আদায় করবেন। এমনকি ঋতুবর্তীরাও ঈদগাহে যাবেন এবং দো‘আয় অংশগ্রহণ করবেন তথা খুৎবা শ্রবণ করবেন।

৩. কুরবানী করা : যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের বিশেষ আরেকটি আমল হ’ল কুরবানী করা। পৃথিবীর প্রত্যেক মুসলমান চাই সে হজ্জ পালনকারী হন বা হজ্জের বাইরে থাকুন সকলেই এই দিনে কুরবানী করে আল্লাহ্র আদেশ পালন করেন। হজ্জে তামাত্তু‘ ও হজ্জে ক্বিরানকারীগণ মিনা ও তার আশপাশ হারাম এলাকায় আর হজ্জের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মুসলমানরা তাদের স্ব স্ব অবস্থানস্থলে কুরবানী করেন। কুরবানীর নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, فَصَلِّ لِرَبِّـــكَ وَانْحَـــرْ ‘তুমি তোমার রবের জন্য ছালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর’ *(কাওছার ১০৮/২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا، ‘যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের কাছেও না আসে’।[৪৬] তবে কুরবানী করা ওয়াজিব নয় বরং সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। লোকেরা যাতে এটাকে ওয়াজিব মনে না করে, সেজন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আবুবকর ছিদ্দীক, ওমর ফারূক, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, বেলাল, আবূ মাসঊদ আনছারী (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ কখনো কখনো কুরবানী করতেন না।[৪৭] প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে প্রত্যেক বছর একটি পশু দ্বারা কুরবানী করাই যথেষ্ট।[৪৮] তবে তাক্বওয়া সহকারে *(হজ্জ ২২/৩৭)* যে যত বেশী করবে তার তত ছওয়াব হবে।[৪৯]

৪. ছিয়াম পালন করা : যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের বিশেষ আমল হ’ল ছিয়াম পালন করা। নবী করীম (ছাঃ)-এর কোন স্ত্রী থেকে বর্ণিত যে, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ تِسْعًا مِنْ ذِى الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلاَثَةَ أَيَّـــامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَخَمِيسَـــيْنِ– ‘রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) যিলহজ্জ মাসের নয় দিন, আশূরার দিন এবং প্রত্যেক মাসের তিন দিন, মাসের দুই সোমবার এবং বৃহস্পতিবার ছিয়াম পালন করতেন’।[৫০]

যিলহজ্জ মাসের প্রথম নয় দিন ছিয়াম পালন করার গুরুত্ব থাকলেও আরাফাতের দিন ছিয়াম পালনের আলাদা ফযীলত রয়েছেন। আর তা হ’ল বিগত ও আগত এক বছরের গুনাহের কাফফারা।[৫১] রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ ذَنْبَ سَنَتَيْنِ مُتَتَابِعَتَيْنِ ‘যে ব্যক্তি আরাফার দিন ছিয়াম রাখে তার পরপর দুই বৎসরের পাপরাশি মাফ হয়ে যায়’।[৫২]

৫. যিকর করা : এই দশ দিনের অন্যতম আমল হ’ল আল্লাহ্র বেশী বেশী যিকর করা তথা তাকবীর, তাহমীদ ও তাহলীল পাঠ করা। মহান আল্লাহ বলেন, لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ‘যেন তারা নিজেদের কল্যাণের স্থানসমূহে হাযির হ’তে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুস্পদ জন্তু থেকে যে রিযিক দিয়েছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করতে পারে’ *(হজ্জ ২২/২৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللهِ وَلاَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوْا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّحْمِيْدِ– ‘এই দিনসূহ আল্লাহ্র নিকট অধিক মর্যাদাপূর্ণ এবং এই দশদিনের মধ্যে সম্পাদিত আমল আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়। সুতরাং এই দিনগুলিতে তোমরা বেশী বেশী তাহলীল, তাকবীর ও তাহমীদ পাঠ কর’।[৫৩]

যারা হজ্জে থাকবে তাদেরকেও আল্লাহ এই দিনগুলিতে যিকরের নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষ করে আরাফার ময়দান থেকে ফিরে আসার পর। যেমন আল্লাহ বলেন, فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ‘সুতরাং যখন তোমরা আরাফাত হ’তে ফিরে আসবে, তখন মাশ‘আরুল হারামের কাছে পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন ঠিক সেভাবে তাঁকে স্মরণ করবে’ *(বাক্বারাহ ২/১৯৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হজ্জের অবস্থা সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَبِّى وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ– ‘আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সকালে মিনা থেকে আরাফার দিকে রওয়ানা হই। তখন আমাদের মধ্যে কেউ তালবিয়া পাঠ করেছেন এবং কেউ তাকবীর পাঠ করেছেন’।[৫৪]

হজ্জের কাজ শেষ করার পর আল্লাহকে স্মরণ করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِـــكَكُمْ فَـــاذْكُرُوا اللهَ

---

৪৫. বুখারী হা/৯৫৬।
৪৬. ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৪৯০।
৪৭. বায়হাক্বী ৯/২৬৪ পৃ. হা/১৯৫০৬; ইরওয়া হা/১১৩৯, ৪/৩৫৪; মির‘আত ৫/৭২-৭৩; উছায়মীন, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২৫/১০। গৃহীত: মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মাসায়েলে কুরবানী, পৃ: ১১।
৪৮. আবুদাঊদ হা/২৭৮৮; তিরমিযী হা/১৫১৮; মিশকাত হা/১৪৭৮।
৪৯. বুখারী হা/১৭১৪, মুসলিম হা/১৩১৯।
৫০. নাসাঈ হা/২৪১৭, হাদীছ ছহীহ।
৫১. মুসলিম হা/২৮০৩; আবুদাউদ হা/২৪২৫; মিশকাত হা/২০৪৪।
৫২. ত্বাবারাণী হা/৫৭৯০; ছহীহুত তারগীব হা/১০১২।
৫৩. আহমাদ হা/৫৪৪৬; ছহীহুত তারগীব হা/১২৪৮।
৫৪. মুসলিম হা/১২৮৪; আবুদাঊদ হা/১৮১৬; নাসাঈ হা/২৯৯৮।

كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْـــرًا– 'অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহকে এভাবে স্মরণ করবে যেভাবে তোমরা তোমাদের পিতৃ পুরুষদের স্মরণ করে থাক, অথবা তারচেয়েও অধিক' *(বাক্বারাহ ২/২০০)*।

৬. তাকবীর পাঠ করা : তাকবীর তথা আল্লাহ্‌র বড়ত্ব ঘোষণা করা এই দিনগুলির অন্যতম আমল। তাকবীর পাঠের সময়সীমা দুই ধরনের হ'তে পারে।

প্রথমতঃ আম বা ব্যাপাক তাকবীর : যিলহজ্জ মাসের প্রথম তারিখ থেকে তের তারিখ পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করা। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّـــامٍ مَعْـــدُودَاتٍ، 'আর তোমরা গণনাকৃত দিনগুলিতে আল্লাহকে স্মরণ করবে' *(বাক্বারাহ ২/২০৩)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْـــدُودَاتٍ *(বাক্বারাহ ২/২০৩)* দ্বারা (যিলহজ্জ মাসের) দশ দিন বুঝায় এবং والأَيَّامِ الْمَعْـــدُودَاتِ দ্বারা 'আইয়ামুত-তাশরীক' বুঝায়। ইবনু ওমর ও আবূ হুরায়রা (রাঃ) এই দশ দিন তাকবীর বলতে বলতে বাযারের দিকে যেতেন এবং তাদের তাকবীরের সঙ্গে অন্যরাও তাকবীর বলত। মুহাম্মাদ ইবনু আলী (রহঃ) নফল ছালাতের পরেও তাকবীর বলতেন।[৫৫]

দ্বিতীয়তঃ নির্দিষ্ট দিনে তাকবীর : যিলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখ ফজর থেকে ১৩ তারিখ আছর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয ছালাতের শেষ তাকবীর বলবে।[৫৬] আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) আরাফার দিন ফজর থেকে কুরবানীর দিন আছর পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করতেন।[৫৭] তাকবীরের শব্দাবলী নিম্নরূপ-

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

উচ্চারণ: *'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ'*।[৫৮] হাজীগণ ইহরাম বাঁধার পর তাকবীর দিবেন। তবে হজ্জের দিনগুলি তথা ৮-১২ ই যিলহজ্জ বেশী বেশী নিম্নোক্ত তালবিয়া পাঠ করবেন।

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ–

'আমি হাযির হে আল্লাহ, আমি হাযির। আমি হাযির। তোমার কোন শরীক নেই, আমি হাযির। নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা, অনুগ্রহ ও সাম্রাজ্য সবই তোমার; তোমার কোন শরীক নেই'।[৫৯] এই দিনগুলিতে তাকবীর উচ্চস্বরে পাঠ করবেন।[৬০]

৫৫. বুখারী হা/৯৬৯-এর অনুচ্ছেদ দ্র.।
৫৬. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৪/২২০।
৫৭. শু'আয়েব আরনাঊত্ব, যাদুল মা'আদ ২/৩৬০।
৫৮. দারাকুৎণী হা/১৭৫৬; ইরওয়াউল গালীল ৩/১২৫ হা/৬৫৪।
৫৯. বুখারী হা/১৫৪৯; মুসলিম হা/১১৮৪; আবুদাঊদ হা/১৮১২।
৬০. বুখারী হা/২৬৯৭; আবুদাঊদ হা/৪৬০৬; ইবনু মাজাহ হা/১৪।

৭. চুল ও নখ কর্তন না করা : যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের আরেকটি আমল হ'ল যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে কুরবানী পর্যন্ত চুল ও নখ কর্তন না করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ بَشَرِهِ شَيْئًا، وَفِي رِوَايَةٍ فَلاَ يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلاَ يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا، وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ رَأَى هِلاَلَ ذِى الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ،

'তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখলে, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক শুরু হয়ে গেলে সে যেন নিজের চুল ও চামড়ার কোন কিছু স্পর্শ না করে (না কাটে)। অন্য এক বর্ণনায় আছে, সে যেন কেশ না ধরে ও নখ না কাটে। অপর এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের নব চাঁদ দেখবে ও কুরবানী করার নিয়ত করবে, সে যেন নিজের চুল ও নিজের নখগুলি না কাটে।[৬১] ঈদের ছালাতের পর কুরবানী করে নখ ও চুল কাটতে পারবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার কুরবানীর পশু রয়েছে, সে যেন যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ উঠার পর থেকে কুরবানী করার পূর্ব পর্যন্ত তার চুল ও নখ না কাটে।[৬২]

কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ইখলাছের সাথে এ আমল করে তাহ'লে ঐ ব্যক্তি কুরবানীর পূর্ণ ছওয়াব পাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা কুরবানীর দিনকে এ উম্মতের জন্য ঈদ হিসাবে পরিগণিত করেছেন। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি যদি দুগ্ধবতী ছাগল ছাড়া অন্য কোন পশু না পাই তবে কি তা দিয়েই কুরবানী করব? তিনি বললেন, لاَ وَلَكِنْ خُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللهِ، 'না, তবে তুমি এ দিন তোমার চুল ও নখ কাটবে। তোমার গোঁফ কাটবে। নাভির নিচের পশম কাটবে। এটাই আল্লাহ্‌র নিকট তোমার পরিপূর্ণ কুরবানী'।[৬৩]

পরিশেষে বলব, উপরে বর্ণিত আমলগুলি সম্পাদনের মাধ্যমে যিলহজ্জ মাসের ফযীলত লাভ করা যায় এবং অশেষ ছওয়াব হাছিল করা যায়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে উক্ত আমলগুলি সঠিকভাবে পালন করে পরিপূর্ণ ছওয়াব লাভের তাওফীক দান করুন-আমীন!

৬১. মুসলিম হা/১৯৭৭; নাসাঈ হা/৪৩৬৪; মিশকাত হা/১৪৫৯।
৬২. মুসলিম হা/১৯৭৭; আবু দাউদ হা/২৭৯১; তিরমিযী হা/১৫২৩।
৬৩. আবুদাঊদ হা/২৭৮৯; নাসাঈ ৪৩৬৫। আলবানী একে যঈফ বলছেন। হাকেম একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। শু'আয়েব আরনাঊত্ব 'হাসান' বলেছেন। আর এটাই অগ্রাধিকারযোগ্য। সম্ভবতঃ শায়েখ আলবানী রাবী ঈসা বিন হেলাল সম্পর্কে ইয়াকূব আল-সাখাভীর 'তাওছীক্ব' লক্ষ্য করেননি। এছাড়াও তিনি হাদীছটির মতনে যে অসংগতির কথা বলেছেন সেটি কোন মৌলিক ত্রুটি নয়। দ্রঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা ১৬ পৃ.; মাসিক আত-তাহরীক, ডিসেম্বর ২০১৭, প্রশ্নোত্তর ১৯/৯৯।

নববী চিকিৎসা পদ্ধতি

-ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী*

(৪র্থ কিস্তি)

পুরুষের টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান নিষিদ্ধ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِى النَّارِ، 'টাখনুর নিচে ইযারের (লুঙ্গি, প্যান্ট) যে অংশ থাকবে সেটুকু জাহান্নামে যাবে'।[১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا، 'যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করবে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না'।[২]

পুরুষের টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা শুধু পরকালীন অকল্যাণেরই কারণ নয়, ইহকালীন স্বাস্থ্যগত বিশেষ ক্ষতিরও কারণ। পুরুষের পায়ের টাখনুতে থাকে টেস্টোস্টেরণ নামক যৌন হরমোন, যা সঠিকভাবে কাজ করার জন্য প্রাকৃতিক আলো-বাতাসের প্রয়োজন। টাখনুকে ঢেকে রাখলে টেস্টোস্টেরণ হরমোন শুকিয়ে কমে যায়। ফলে সহজে বাচ্চা হয় না। বর্তমানে এ সমস্যাটি আমাদের সমাজে মহামারির আকার ধারণ করেছে। তাছাড়া টেস্টোস্টেরণের অভাব মস্তিষ্ক 'ঘোলাটে' করে দেয়। এতে মনোযোগ নষ্ট হয়। স্মৃতিশক্তিও কমে আসে ধীরে ধীরে। হয়তো এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন হাদীছে টাখনুর নিচে কাপড় পরাকে নিষিদ্ধ করেছেন'।[৩]

বিষয়টি আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ গবেষণা করে বের করেছেন এবং টাখনুর উপর কাপড় পরিধানের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। আমেরিকার মিসিগান সিটিতে একটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে লেখা রয়েছে, 'টাখনুর উপর প্যান্ট পরিধান করুন। এতে টাখনু ফুলে যাওয়া, যকৃত ও উন্মাদনা রোগ থেকে রক্ষা পাবেন'।[৪]

টাখনুর উপর কাপড় পরার এ সুন্নাত মুসলিমগণ প্রত্যেকেই না মানলেও পশ্চিমা দেশের অমুসলিমরা এটাকে মডেল হিসাবে নিয়েছেন। বিশেষ করে ইতালিতে টাখনুর উপর কাপড় পরে ইতালিয়ান তরুণরা ফ্যাশন করছেন। দীর্ঘ দশ বছর ধরে টাখনুর উপর প্যান্ট পরা তাদের জন্য আধুনিক যুগের মডেল'।[৫]

তবে মহিলাদের জন্য টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরাই সুন্নাত। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ ذَكَرَ الإِزَارَ فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ تُرْخِى شِبْرًا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ فَذِرَاعًا لاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ-

'উম্মু সালামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইযার সম্পর্কে আলোচনা করলেন, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এ ব্যাপারে মহিলাদের বিধান কি? তিনি বললেন, এক বিঘত পরিমাণ ঝুলাতে পারবে। তখন উম্মু সালামাহ (রাঃ) বললেন, এমতাবস্থায় তার অঙ্গ (পা) খুলে যাবে। তিনি বললেন, তবে এক হাত, তার অধিক যেন না হয়'।[৬]

মহিলারা যদি পা খোলা পায়জামা বা টাখনুর উপর কাপড় পরিধান করে, তাহ'লে তাদের নারী জনিত Hormone-এর হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে শরীরের ভিতর ফুলে যাওয়া (Vaginal Inflammation), কোমর ব্যথা, স্নায়ুবিক দুর্বলতা, খিঁচুনী ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়।[৭]

নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করা :

নিয়মিত হাঁটাহাঁটি স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকারী। ডায়াবেটিস রোগী হ'লে অথবা ডায়াবেটিসসহ অনেক রোগ থেকে রক্ষা পেতে হাঁটাহাঁটির বিকল্প খুব কমই আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও হাঁটাহাঁটিকে উৎকৃষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি বলেছেন। তিনি বলেছেন, إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُم بِهِ السَّعُوْطُ وَاللَّدُوْدُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِيُّ- 'তোমরা যা দ্বারা চিকিৎসা কর তার মধ্যে উত্তম হ'ল, নাকে ঔষধ দেয়া, মুখ দিয়ে ঔষধ সেবন করা, হিজামা ও হাঁটাহাঁটি করা'।[৮]

হাঁটা সবচেয়ে সহজ ব্যায়াম। ছোট-বড় যে কেউ নিয়মিত হাঁটার অভ্যাস করতে পারেন। প্রশ্ন জাগতে পারে ব্যায়ামের জন্য এত কিছু থাকতে হাঁটা কেন গুরুত্বপূর্ণ? হাঁটলে প্রাকৃতিকভাবে পাবেন সুস্থতা ও প্রাণবন্ত অনুভূতি। আরও রয়েছে শত উপকার। স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট 'টেসকো লিভিং ডটকম'-এ হাঁটার ১০টি উপকারিতা উল্লেখ করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ-

১. সুস্থ হৃদপিণ্ড ও সুন্দর জীবন : যারা নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করেন তাদের হার্টের অসুখ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। এছাড়া হাঁটার সময় শরীর থেকে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল এলডিআর কমে যায় ও ভালো কোলেস্টেরল এইচডিআর-এর মাত্রা বেড়ে যায়। এছাড়া শরীরের রক্তচলাচল স্বাভাবিক থাকে।

এ বিষয়ে যুক্তরাজ্যের স্ট্রোক এসোসিয়েশনের এক গবেষণায় দেখা গেছে, যারা প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটেন, তাদের

---

* মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদ্রাসা, জামালপুর।

১. বুখারী হা/৫৭৮৭; নাসাঈ হা/৫৩৩১।
২. বুখারী হা/৫৭৮৮; মুসলিম হা/২০৮৭; আবুদাঊদ হা/৪০৯৩।
৩. কালের কণ্ঠ, ৮ জুলাই ২০১৯।
৪. সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান ১/১৩৫-১৩৬ পৃঃ।
৫. ডিবিসি নিউজ, ১৫ মে, ২০১৯।
৬. আবুদাঊদ হা/৪১১৭; নাসাঈ হা/৫৩৩৬; ছহীহাহ হা/১৮৬৪।
৭. সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান ১/১৩৬ পৃঃ।
৮. তিরমিযী হা/২০৫৩ 'চিকিৎসা' অধ্যায়, সনদ ছহীহ।

উচ্চরক্তচাপের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। যাদের উচ্চরক্তচাপ রয়েছে, তাদের উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ হয়। এছাড়া নিয়মিত হাঁটার অভ্যাস করলে শতকরা ২৭ ভাগ পর্যন্ত উচ্চরক্তচাপজনিত সমস্যা কমে। ফলে হার্টের বিভিন্ন রোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে যায়।

এদিকে আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, নিয়মিত হাঁটার অভ্যাস করলে করোনারি হৃদরোগের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। রক্তে চিনির মাত্রা স্বাভাবিক রাখতে ও স্থূলতার ঝুঁকি কমাতে নিয়মিত হাঁটার পরামর্শ দিয়েছেন হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের বিশেষজ্ঞরা।

২. বাড়বে সুস্থতা : যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে ডাক্তারের পরামর্শে তারা নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করেন। এতে অবশ্য তারা উপকার পান। মজার কথা হ'ল এতে টাইপ টু ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও কমে যায়। ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, নিয়মিত হাঁটলে ৬০ ভাগ পর্যন্ত কোলন ক্যান্সার ও স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে। এটা স্বাস্থ্যের জন্যও খুব ভালো।

৩. ওযন নিয়ন্ত্রণে ব্যায়াম : ওযন নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিভিন্ন রকম ব্যায়াম করতে দেখা যায়। ওযন কমাতে প্রতিদিন ৬০০ ক্যালরি পুড়িয়ে ফেলতে হবে। যেটা একদিনের খাবার থেকে প্রাপ্ত ক্যালরির চেয়ে বেশী। যার ওযন ৬০ কেজি তিনি যদি প্রতিদিন ঘণ্টায় ২ মাইল গতিতে ৩০ মিনিট হাঁটার অভ্যাস করেন, তবে ৭৫ ক্যালরি শক্তি ক্ষয় করতে পারেন। ঘণ্টায় ৩ মাইল গতিতে হাঁটতে অভ্যস্ত হ'লে, ৯৯ ক্যালরি পুড়িয়ে ফেলতে পারেন। ঘণ্টায় ৪ মাইল গতিতে হাঁটলে আরও বেশী ক্যালরি ক্ষয় করতে পারবেন। এতে ক্যালরি ক্ষয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ১৫০। তাছাড়া হাঁটলে দেহের পেশীগুলো আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

৪. স্মৃতিশক্তি বাড়ে : বয়স বাড়ার সঙ্গে সাধারণত মানুষের স্মৃতিশক্তি কমে যায়। ৬৫ বা এর বেশী বয়সীদের মধ্যে প্রতি ১৪ জনের মধ্যে ১ জনের স্মৃতিভ্রম হয়। আর ৮০ বা এর বেশী বয়সীদের ৬ জনের মধ্যে ১ জনের দেখা দেয় স্মৃতি হারানোর রোগ। নিয়মিত বিভিন্ন ব্যায়াম অনুশীলনে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বাড়ে। এতে স্মৃতিহানী হওয়ার ঝুঁকি ৪০ ভাগ পর্যন্ত কমে যায়। যুক্তরাজ্যে এক গবেষণায় দেখা গেছে, বয়স্কদের মধ্যে যারা সপ্তাহে অন্তত ৬ মাইল পথ হাঁটেন তাদের স্মৃতিশক্তি অটুট থাকে।

৫. জয়েন্টে ব্যথার ঝুঁকি নেই : নিয়মিত হাঁটাচলা করলে শরীরের বিভিন্ন জয়েন্টে ব্যথার ঝুঁকি কমে যায়। সাধারণত বয়স বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের শরীরের বিভিন্ন হাড় ও সংযোগস্থলে ব্যথা করে। শরীরের জয়েন্টগুলোকে সুস্থ রাখতে হাঁটা নিঃসন্দেহে খুবই কার্যকর ব্যায়াম।

৬. পায়ের শক্তি বাড়ায় : হাঁটলে শুধু পায়ের শক্তিই বাড়ে না পায়ের আঙ্গুলেরও ব্যায়াম হয়। এছাড়া কোমর এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গ নড়াচড়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই সুস্থ থাকে।

৭. বাড়ে পেশীশক্তি : হাঁটলে শুধু পা চলে না দু'হাতও সমান তালে চলে। এতে হাতের প্রতিটি জয়েন্ট, ঘাড় ও কাঁধের ব্যায়াম হয়। ব্যাকপেইনের সমস্যা কমে যেতে পারে নিয়মিত ব্যয়ামের মাধ্যমে।

৮. ভিটামিন ডি : দিনের আলোতে, বিশেষ করে সকালে হাঁটার অভ্যাস করলে শরীর ভিটামিন ডি-তে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। দৈনন্দিন খাবার থেকে খুব অল্প পরিমাণে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত ৪ হাযার ৪৪৩ জনের শরীরে ভিটামিন ডি-এর প্রভাব নিয়ে গবেষণা করে। দেখা গেছে, যাদের শরীরে ভিটামিন ডি পর্যাপ্ত রয়েছে তারা অন্যদের তুলনায় অন্তত দ্বিগুণ সময় রোগটির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে পারে। গবেষকরা আরও জানান, ভিটামিন ডি অন্যান্য কোষের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সক্রিয় করে। এতে ক্যান্সারে আক্রান্ত কোষ সহজে অন্য কোষে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। এজন্য হাঁটা হ'তে পারে উত্তম ব্যায়াম।

৯. প্রাণবন্ত শরীর ও মন :

সকালের প্রকৃতি এমনিতেই থাকে স্নিগ্ধ। এ সময় হাঁটার মজাই আলাদা। প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগের সময় মন স্বাভাবিকভাবেই ফুরফুরে থাকে, শরীর ও মন সতেজ হয়। শরীরের প্রতিটি জয়েন্টে অক্সিজেনের প্রাণপ্রবাহে মাংসপেশীগুলো শিথিল ও রিলাক্সড হয়।

১০. সুখ প্রতিক্ষণ : যাদের নিয়মিত হাঁটার অভ্যাস, তাদের সঙ্গীর অভাব হয় না। একজন আরেকজনের সঙ্গে ভাগাভাগি করেন আনন্দের মুহূর্তগুলো। সামাজিক পরিমণ্ডলে প্রভাব বাড়ার পাশাপাশি মানসিক চাপ ও টেনশন কমা শুরু করে। ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার এক জরিপে দেখা গেছে, নিয়মিত হাঁটাচলা করলে একাকিত্বের অনুভূতি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা যায়। এছাড়া জরিপে অংশ নেওয়া ৮৩ ভাগ মানুষ জানিয়েছেন নিয়মিত হাঁটার অভ্যাস করলে মেজায নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়। এতে মানসিক স্বাস্থ্যও ভালো থাকে।[৯]

খাৎনার উপকারিতা :

ইসলামের প্রতিটি বিধানই ইহকাল ও পরকালের জন্য কল্যাণকামী। এমনই একটি বিধান হ'ল খাৎনা করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ. 'ফিৎরাত পাঁচটি। যথা- খাৎনা করা, নাভির নিচে ক্ষুর ব্যবহার করা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা ও গোঁফ খাটো করা'।[১০]

খাৎনা করার স্বাস্থ্যগত উপকারিতা অনেক। যেমন- 'খাৎনা দ্বারা শরীর অধিক পাকপবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকে। খাৎনা করালে শিশুদের মূত্রপথের সংক্রমণ প্রতিরোধ হয়। এর ফলে

৯. ফজলে আজিম, বিডিনিউজ টুয়েন্টি ফোর ডটকম, ১২ই মার্চ, ২০১৪।
১০. বুখারী হা/৫৮৮৯; মুসলিম হা/২৫৭; আহমাদ হা/৭১৪২।

প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, জ্বর, খাবারে অনীহা এবং স্বাস্থ্য ভালো না হওয়া ইত্যাদি রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়। খাৎনা করালে লিঙ্গের ক্যান্সার প্রতিরোধ হয় ও যৌনবাহিত রোগের ঝুঁকি কমে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, পুরুষের খাৎনা এইচআইভি বা এইডস প্রতিরোধেও কার্যকর ভূমিকা রাখে। আফ্রিকার যেসব দেশে খাৎনার হার বেশী, সেসব দেশে এইডসের হার তুলনামূলক কম'।[১১]

১৯৮৯ সালে প্রকাশিত আমেরিকান সায়েন্স ম্যাগাজিনের একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, 'খাৎনা এইডস থেকে রক্ষা করে'। এ প্রতিবেদনটি আমেরিকা এবং আফ্রিকায় পরিচালিত তিনটি জরিপের ভিত্তিতে রচিত হয়। এ বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় যে, খাৎনাহীন লোকদের মাঝে এইডস-এর প্রকোপ বেশী দেখা যায়।[১২]

খাৎনার সুফল নিয়ে অস্ট্রেলীয় মেডিক্যাল সায়েন্সের অধ্যাপক ড. ব্রায়ান মরিস চমৎকার গবেষণা করেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়, যেসব বালকের খাৎনা করা হয়নি, তাদের অপেক্ষাকৃত কিডনি, মূত্রথলি ও মূত্রনালির ইনফেকশন ৪ থেকে ১০ গুণ বেশী হয়। তিনি মনে করেন, খাৎনার মাধ্যমে মূত্রনালির ইনফেকশন অন্তত এক-চতুর্থাংশ হ্রাস করা যায়'।[১৩]

কিন্তু ইংল্যাণ্ড জার্নাল ফর মেডিসিন পত্রিকার ১৯৯০ সংখ্যায় বলা হয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং কোরিয়া-ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় আমেরিকান সৈন্যদের লিঙ্গ অগ্রভাগের প্রদাহ এবং যৌন রোগ থেকে রক্ষায় খাৎনা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে'। অস্ট্রেলিয়ার একটি সাম্প্রতিক জরিপ থেকে জানা যায় যে, খাৎনাহীন মানুষের মধ্যে চার প্রকারের রোগ সচরাচর বেশী হয়। (১) লিঙ্গে পাঁচড়া (২) Candidiasis (৩) গনোরিয়া (৪) সিফিলিস।[১৪]

ওয়াশিংটনের সৈনিক মেডিকেল কলেজের শিশুস্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান প্রফেসর ডাঃ বিজবেল বলেন, আমি প্রথমে খাৎনার বিরোধী ছিলাম, পরে দীর্ঘ গবেষণার ফলে প্রমাণিত হ'ল যে, মূত্রথলি ও মূত্রনালি বিষয়ক অনেক জটিল রোগের সমাধান হ'ল খাৎনা। ডাঃ রুবসন তাঁর গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেন, ১৯৩০ থেকে এ পর্যন্ত ৬০ হাযার মানুষ আমেরিকায় মূত্রনালির ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছে, এর মধ্যে কেবল ১০ জন খাৎনাকৃত, বাকী সব খাৎনাবিহীন ব্যক্তি।[১৫]

১৯৯০ খৃষ্টাব্দের ম্যাগাজিন 'নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন' (New England Journal of Medicine) এ ডাক্তার শেভান লিখেছেন, 'নিঃসন্দেহে শিশু বেলার খাৎনা আজীবন যৌনাঙ্গের পরিচ্ছন্নতা সহজসাধ্য করে। এমনিভাবে এতে করে শৈশবে লিঙ্গের অগ্রভাগের বর্ধিত চামড়ার নীচে কোন রোগের জীবাণু আশ্রয় নিতে পারে না।

১১. *মুফতি মাহমুদ হাসান, সুন্নাতে খাৎনার বিস্ময়কর সুফল (প্রবন্ধ) কালের কণ্ঠ, ৭ই এপ্রিল ২০১৭।*
১২. *সুন্নাতে রাসূল ও দাতব্য ও আধুনিক বিজ্ঞান ৩/৮২ পৃঃ।*
১৩. *কালের কণ্ঠ, ৭ই এপ্রিল ২০১৭।*
১৪. *সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান ৩/৮১ পৃঃ।*
১৫. *কালের কণ্ঠ, ৭ই এপ্রিল ২০১৭।*

১৯৮৯ খৃষ্টাব্দে পরিচালিত একটি জরিপে দেখা যায় খাৎনাকৃত শিশুদের তুলনায় খাৎনাহীন শিশুদের মূত্রনালীর প্রদাহের আশংকা ৩৯ গুণ বেশী। ৪ কোটি শিশুদের উপর জরিপ নেওয়ার পর প্রফেসর ভয়েস ভেইস বলেন, খাৎনাহীন শিশুদের মধ্যে মূত্রনালীর প্রদাহ বেশী পাওয়া গিয়েছে। একইভাবে বিশেষজ্ঞদের আরেকটি টীমের অনুমান অনুযায়ী 'আমেরিকায় খাৎনা প্রচলন না হ'লে প্লীহা এবং মূত্রথলির প্রদাহে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা হ'ত হাযার হাযার। বৃটেনের লনেষ্ট নামক প্রসিদ্ধ ম্যাগাজিনের ১৯৮৯ সংখ্যায় বলা হয় যে, 'জন্মের পরই শিশুদেরকে খাৎনা করানো হ'লে মূত্রনালীর প্রদাহ ৯০ শতাংশ হ্রাস পাবে'।[১৬]

প্রতিষেধক হিসাবে মধু :

মধু মহান আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে বান্দার জন্য অপরিসীম নে'মত। যার মধ্যে মানুষের জন্য শেফা তথা রোগমুক্তির ব্যবস্থা রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، 'তার পেট থেকে নির্গত হয় নানা রঙের পানীয়। যার মধ্যে মানুষের জন্য আরোগ্য নিহিত রয়েছে' *(নাহল ১৬/৬৯)*।

মধু দু'ভাবে ব্যবহৃত হয়। যথা- (১) বিভিন্ন রোগের প্রতিকার বা প্রতিষেধক হিসাবে (২) সরাসরি নির্দিষ্ট রোগের ঔষধ হিসাবে।

মধু নির্দিষ্ট কোন একটি রোগের প্রতিষেধক নয়। বরং মধু এমন এক পানীয় যাতে অসংখ্য রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। কেননা মধুতে এমন সকল খাদ্যগুণ ও ঔষধিগুণ রয়েছে, যা কালোজিরা ব্যতীত অন্য দ্রব্যে নেই। যেমন- মধুর শতকরা গড় উপাদান হচ্ছে ৪০.৪% লেভালুজ, ৩৪% ডেকসট্রোজ, ১.৯% সুক্রোজ, ১৭.৭% পানি, ১.৯% ডেকসট্রিন ও গাস এবং ০.১৮% ভষণ। এছাড়া মধুর মধ্যে আছে ১.৫-৬% অন্যান্য পদার্থ। আবার কারো কারো মতে, ১০০ গ্রাম মধুতে নিম্নলিখিত উপাদান পাওয়া যায়। পানি ১৪-২০ গ্রাম, শর্করা ৭০.৮০ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৫ মিলিগ্রাম, খনিজ লবণ ০.২ গ্রাম, আমিষ ০.৩ গ্রাম, ভিটামিন-বি ০.০৪ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-সি ৪.০০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-এ সামান্য পরিমাণ, ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স সামান্য পরিমাণ। মধুতে যে সব এসিড পাওয়া যায় সেগুলির নাম সাইট্রিক, ম্যালিক, বুটানিক, গ্লুটামিক, স্যাক্রিনিক, ফরমিক, এসেটিক, পাইরোগ্লুটামিক এবং এমাইনো এসিড।[১৭]

মধুতে মিশ্রিত খনিজ দ্রব্যগুলি হচ্ছে পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, সিলিকা, ম্যাগনেসিয়াম, ফ্লোরাইড, সালফেট, ফসফেট, কপার, লৌহ, ম্যাংগানিজ প্রভৃতি। থায়ামিন, রিভোফ্লোবিন, ভিটামিন কে এবং ফলিক এসিড নামক ভিটামিন মধুতে বিদ্যমান থাকে।[১৮]

১৬. *প্রাগুক্ত, ৩/৮০-৮১ পৃঃ।*
১৭. *Scientific Indications in the holy Quran. (Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1995) P. 288, কৃষি ও বনায়ন (ঢাকা : ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইফাবা, ২য় প্রকাশ ১৯৯৭), ১৪২-১৪৩ পৃঃ।*
১৮. *ডাঃ মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন সুন্নাহ (ঢাকা : কাসেমিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৯), পৃঃ ২৪; মাসিক আত-তাহরীক, এপ্রিল-মে ২০০২, পৃঃ ২০।*

বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, মধুর মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী জীবাণু নাশক ক্ষমতা। এই ক্ষমতার নাম 'ইনহিবিন'। মধুর সাথে কোন তরল পদার্থ মিশ্রিত হ'লে তা তরলীভূত হয়ে পড়ে। গ্লুকোজ অক্সিডেজ নামক বিজারকের সাথে মধুর বিক্রিয়া ঘটলে গ্লুকোনা ল্যাকটোন হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডে পরিণত হয়। এই বিক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া মধুতে ডুবিয়ে দিলে মারা যায়। মধু ইষ্টের (Yeast) বংশ বৃদ্ধি ঘটতে দেয় না। এ কারণে খাটি মধু বোতলজাত করে অনেক দিন রাখা যায়। মধু একটি উৎকৃষ্ট প্রিজার্ভেটিভ বা সংরক্ষক। চিকিৎসা শাস্ত্রের এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদীতে ঔষধী গুণ বেশী দিন ধরে রাখার জন্য ঔষধের সাথে এলকোহল বা রেকটিফাইড স্পিরিট মিশানো হয়। ইউনানীতে তৎপরিবর্তে মিশানো হয় মধু। বার্মার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ শবদাহ করার পূর্বে মধুতে ডুবিয়ে রেখে সংরক্ষণ করতেন। মিসরে গিজেহ পিরামিডের গহ্বর মধু দ্বারা পূর্ণ করা ছিল। সারা পৃথিবীতে কাশির ঔষধ ও অন্যান্য মিষ্টি দ্রব্য তৈরী করতে প্রতিবছর কম পক্ষে ২০০ টন মধু ব্যবহৃত হয়। খুসখুসে কাশিতে মধুর সাথে লেবুর রস উপশমদায়ক। মাতাল রোগীদেরকে স্থিরাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে মধু কার্যকরী ভূমিকা রাখে।[১৯]

'নিয়মিত সঠিকভাবে মধু পান করলে রক্তশূন্যতা, ডায়রিয়া বা উদরাময়, আমাশয়, হাঁপানী, কানের ব্যথা ও কান পাকা, দন্ত রোগ, পেট ব্যথা, চর্মরোগ, জন্ডিস, অর্শ্বরোগসহ বেশ কিছু রোগের উপকার পাওয়া যায়'।[২০]

নিয়মিত মধু পান রক্ত কণিকার সংখ্যা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। কাজেই এনিমিয়া আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে মধু উত্তম পানীয়। হাঁপানী রোগে মধুর স্থান সবার উপরে। প্যারিসের ইনষ্টিটিউট অব বী-কালচার-এর পরিচালক রিমে কুভিন বলেন, 'রক্তক্ষরণ, রিকেট, ক্যান্সার এবং শারীরিক দুর্বলতায় মধুর অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে। চিনির পরিবর্তে শিশুদেরকে মধু পান করতে দেয়া হয়। চিনি দন্ত ক্ষয় ঘটায় কিন্তু মধু তা করে না। মধু ব্যবহারে নবজাতক স্বাস্থ্যবান ও সবল হয়ে ওঠে। গ্লুকোজের ঘাটতিতে হৃদপেশীর শক্তি কমে যায়। মধু ব্যবহারে এ ঘাটতি পূরণ করতে সক্ষম। ধমনী সম্প্রসারণ করোনারী শিরার রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে মধুর ভূমিকা অপরিসীম'।[২১]

মধুর আরো বিশেষ কতগুলো গুণ আছে। যেমন মধু শীতল, লঘুপাক, অগ্নিবল বৃদ্ধিজনক, মলরোধক, চক্ষু পরিষ্কারক, ভগ্ন সংযোগ, ব্রণরোধক, ত্রিদোষ নাশক, শুক্রস্তম্ভ কারক এবং হিক্কা, কাশ, জ্বর, অতিসার, বমি, তৃষ্ণা, কৃমি ও বিষদোষ নাশক। নতুন মধু কিঞ্চিৎ শ্লেষ্মা বর্ধক ও শরীরের স্থুলতা সম্পাদক'।[২২]

১৯. *ইসলামী বিধান ও আধুনিক বিজ্ঞান পৃঃ ১৪৫-১৪৬।*
২০. *মাসিক অগ্রপথিক (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ), এপ্রিল ২০০১, পৃঃ ১১৪।*
২১. *ইসলামী বিধান ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ১৪৬।*
২২. *মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, বিজ্ঞান না কোরআন (কলিকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৬), পৃঃ ৩১৯।*

প্রতিষেধক হিসাবে কালোজিরা :

কালোজিরার গুণাগুণ ও উপকারিতা অপরিসীম, অসাধারণ ও কালজয়ী। প্রাচীনকাল থেকে কালোজিরা নানা রোগের প্রতিষেধক এবং পতিরোধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلاَّ مِنَ السَّامِ قُلْتُ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ– 'এই কালোজিরাতে 'সাম' ছাড়া সব রোগের নিরাময় আছে। আমি বললাম, সাম কি? তিনি বললেন, 'মৃত্যু'।[২৩] নিয়মিত ও পরিমিত কালোজিরা সেবনে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সতেজ করে ও সার্বিকভাবে স্বাস্থ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধন করে।

কালোজিরাতে প্রায় শতাধিক পুষ্টি ও উপকারী উপাদান আছে। কালোজিরা খাদ্যাভ্যাসের ফলে আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কালোজিরা ফুলের মধু উৎকৃষ্ট মধু হিসাবে বিশ্বব্যাপী বিবেচিত, কালোজিরার তেল আমাদের শরীরের জন্য অনেক উপকারী। বর্তমানে কালোজিরা ক্যাপসুলও বাযারে পাওয়া যায়। এতে রয়েছে ক্যান্সার প্রতিরোধক ক্যারোটিন ও শক্তিশালী হরমোন, বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধকারী উপাদান, পাচক এনজাইম ও অম্লনাশক উপাদান এবং অম্লরোগের প্রতিষেধক। এর প্রধান উপাদানের মধ্যে আমিষ ২১ শতাংশ, শর্করা ৩৮ শতাংশ, স্নেহ বা ভেষজ তেল ও চর্বি ৩৫ শতাংশ। এছাড়াও ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ আছে। প্রতি গ্রাম কালোজিরা পুষ্টি উপাদান হলো প্রোটিন ২০৮ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন বি ১.১৫ মাইক্রোগাম, নিয়াসিন ৫৭ মাইক্রোগ্রাম, ক্যালসিয়াম ১.৮৫ মাইক্রোগ্রাম, আয়রণ ১০৫ মাইক্রোগ্রাম, ফসফরাস ৫.২৫ মিলিগ্রাম, কপার ১৮ মাইক্রোগ্রাম, জিংক ৬০ মাইক্রোগ্রাম, ফোলাসিন ৬১০ আইউ। কালোজিরার অন্যতম উপাদানের মধ্যে আরও আছে নাইজেলোন, থাইমোকিনোন ও স্থায়ী তেল। পাশাপাশি কালোজিরার তেলে আছে লিনোলিক এসিড, অলিক এসিড, ফসফেট, লৌহ, ফসফরাস, কার্বোহাইড্রেট, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, আয়রণ, জিংক, ম্যাগনেশিয়াম, সেলেনিয়াম, ভিটামিন-এ, ভিটামিন-বি, ভিটামিন-বি২, নিয়াসিন ও ভিটামিন-সি ছাড়াও জীবাণুনাশক বিভিন্ন উপাদান, যা হাযারও উপকার করে।[২৪]

চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ বলেছেন, কালোজিরা হচ্ছে উষ্ণ ও শুষ্ক প্রকৃতির পথ্য। জ্বর, সর্দি ও কাশিসহ পেটের আর্দ্রতার সমস্যায় এটি বেশ উপকারী। এটা গুঁড়া করে গরম পানির সাথে সেবনে প্রস্রাবের সমস্যা দূরীভূত হয়। কালোজিরার গুঁড়া সুতি কাপড়ে নিয়ে শুকলে সর্দি ও ঠাণ্ডা কাশিতে বেশ উপকার হয়। পানির সাথে সামান্য পরিমাণ কালোজিরা খেলে হাঁপানি রোগের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে। ভিনেগার (সিরকা)-এর সাথে গরম করে কুলি করলে দাঁতের ব্যথায় বেশ কার্যকর। অন্যত্র নবী করীম (ছাঃ) কালোজিরাকে

২৩. *বুখারী হা/৫৬৮৭, ৫৬৮৮; মুসলিম হা/২২১৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৪৭।*
২৪. *ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, কালিজিরা ম্যাজিক ফসল, কৃষিতথ্য সার্ভিস (এআইএস), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।*

সাধারণভাবে মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের পথ্য হিসাবে অভিহিত করেছেন।

আবু বকর ইবনুল আরাবীর মতে, চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের নিকট কালোজিরার মাঝে সকল রোগের আরোগ্যের উপাদান রয়েছে। তবে বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে ভিন্ন পদ্ধতিতে ভিন্ন মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।[২৫]

কালোজিরা তেলের উপকার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে, হৃদরোগজনিত সমস্যার আশঙ্কা কমায়, ত্বকের সুস্বাস্থ্য, আর্থ্রাইটিস ও মাংসপেশির ব্যথা কমাতে কালোজিরার তেল উপযোগী। কালোজিরা শরীরের জন্য খুব যরূরী। পেটের যাবতীয় রোগ-জীবাণু ও গ্যাস দূর করে। কালোজিরা কৃমি দূর করার জন্য কাজ করে। কালোজিরা যথাযথ ব্যবহারে দৈনন্দিন জীবনে বাড়তি শক্তি অর্জিত হয়।

এর তেল ব্যবহারে অনিদ্রা দূর করে প্রশান্তির নিদ্রা হয়। ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া নিধন থেকে শুরু করে শরীরের কোষ ও কলার বৃদ্ধিতে সহায়তা করে কালোজিরা। শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা কমায়। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে যেসব সমস্যা হয়, সেসবের যন্ত্রণাদায়ক উপসর্গের তীব্রতা কমাতে পারে কালোজিরা। হাঁটুর/বাতের ব্যথা, স্মরণশক্তি বৃদ্ধি ও উন্নয়ন, মস্তিষ্কের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্মরণশক্তি বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। দেহের সাধারণ উন্নতি, চেহারার কমনীয়তা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে টনিকের মতো কাজ করে কালোজিরা।

বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগ সারাতে, শিশুর দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি করতে, স্বাস্থ্য ভালো রাখতে, হজম সমস্যা দূরীকরণে, লিভারের সুরক্ষায়, রুচি বাড়াতে, ভাইরাস, ছত্রাক, যকৃতের বিষক্রিয়া নাশ ও প্রতিরোধে কালোজিরা কার্যকর। টিউমার এবং ক্যান্সার প্রতিরোধক হিসাবে কালোজিরা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কালোজিরাকে এ্যান্টিসেপটিক বলেও অনেক ভেষজবিদ মনে করেন। কালোজিরায় রয়েছে শরীরের রোগ জীবাণু ধ্বংসকারী উপাদান। এ উপাদানের জন্য শরীরে সহজে ঘা, ফোঁড়া, সংক্রামক রোগ বা ছোঁয়াচে রোগ হয় না।[২৬]

[ক্রমশঃ]

২৫. *তাহক্বীক্ব মিশকাতুল মাছাবীহ ৫/২৮৮ পৃঃ।*

২৬. *কালিজিরা ম্যাজিক ফসল।*

তাবলীগী ইজতেমা ময়দান ও দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি ক্রয় প্রকল্পে দান করুন!

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোনেরা!

কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই সমাজে দ্বীনে হকের প্রচার ও প্রসারে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর বার্ষিক ‘তাবলীগী ইজতেমা’র গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতি বছর ইজতেমায় পূর্ব নির্ধারিত বিষয় সমূহের উপর দলীল ভিত্তিক আলোচনা শ্রোতাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। ফলে হাযার হাযার মানুষ প্রতিনিয়ত বিশুদ্ধ দ্বীনের পথে ফিরে আসছেন। ১৯৮০ সালে সংগঠনের উদ্যোগে ঢাকায় আয়োজিত প্রথম জাতীয় সম্মেলনের পর ১৯৯১ সাল থেকে বিগত ৩০ বছর যাবত এই ইজতেমা রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ইজতেমার পরিসরও প্রতিনিয়ত ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। ফলে বর্তমানে একটির স্থলে পাঁচটি প্যাণ্ডেল করেও স্থান সংকুলান হচ্ছে না। এমতাবস্থায় ২০২১ সালের তাবলীগী ইজতেমার শেষ দিনে মুহতারাম আমীরে জামা‘আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব আগামীতে নিজস্ব ময়দানে তাবলীগী ইজতেমা করার জন্য ৫০ থেকে ১০০ একর জমি ক্রয়ের ঘোষণা দেন এবং সাথে সাথে বহু আগ্রহী ভাই নগদ অর্থ ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত ইজতেমা ময়দানে বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র হিসাবে ১৯৯৪ সাল থেকে আমীরে জামা‘আতের স্বপ্নের দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্র সহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহ থাকবে ইনশাআল্লাহ। যা বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। অতএব দানশীল ভাই-বোনদেরকে উক্ত বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়নে উদার হস্তে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। উল্লেখ্য, প্রতি কাঠা জমির মূল্য সম্ভাব্য ১০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা এবং ইজতেমা ময়দানে প্রতিজনের বসার স্থানের সম্ভাব্য মূল্য ২৫০০/- (আড়াই হাযার) টাকা।

অতএব দানশীল ভাই-বোনদেরকে অন্তত এক কাঠা জমির মূল্য অথবা সামর্থ্য বিবেচনায় কমপক্ষে একজন বসার স্থানের সমপরিমাণ মূল্য দান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। তবে যিনি যত বেশী দান করবেন তার নেকীর পাল্লা তত ভারী হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে উক্ত মহতী কাজে শরীক থাকার তাওফীক দান করুন- আমীন!

টাকা প্রেরণের হিসাব
তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড
একাউন্ট নং ০০৭১২২০০০০৭১৭
আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।
বিকাশ ও নগদ নং ০১৭৯৭৯০০১২৩;
রকেট নং ০১৭৯৭৯০০১২৩০

সেক্রেটারী জেনারেল
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
দারুল ইমারত আহলেহাদীছ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সার্বিক যোগাযোগ : দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭, ০১৭৯৭-৯০০১২৩।

মাসিক আত-তাহরীক জুলাই ২০২১ ২৪তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

অল্পে তুষ্টি

-*আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

(৩য় কিস্তি)

অল্পে তুষ্ট ব্যক্তির কিছু আলামত ও স্তর :

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, অল্পে তুষ্টি ও যুহদ (দুনিয়া বিমুখতা) একই সূত্রে গাঁথা। যাহেদ ও অল্পে তুষ্ট ব্যক্তির কতিপয় আলামত আছে। যেমন :

(১) সে তার অর্জিত সম্পদ নিয়ে অতি উৎফুল্ল হবে না। আবার যা পায়নি, তার জন্য দুশ্চিন্তাও করবে না।

(২) তার সহায়-সম্পদ কখনো তাকে আল্লাহ্র ইবাদত থেকে গাফেল করবে না; বরং পার্থিব কাজে জড়িয়ে পড়লেও তার হৃদয় সর্বদা আল্লাহ্র ভালোবাসায় ভরপুর থাকবে।

(৩) তার পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা খুবই কম হবে। দুনিয়ার দীর্ঘ আশা-প্রত্যাশা নিয়ে সে কখনো বুঁদ হয়ে থাকবে না।

(৪) তার সম্পদ কম হ'লেও আল্লাহ্র পথে দান-ছাদাক্বাহ করতে সে কখনো কৃপণতা করবে না এবং অল্প সম্পদের দোহাই দিয়ে ছাদাক্বাহ করা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখবে না।[১]

ইমাম মাওয়ার্দী (রহঃ)-এর মতে, অল্পে তুষ্টির কিছু স্তর আছে। কেউ উঁচু পর্যায়ের অল্পে তুষ্ট, আবার কেউ তার চেয়ে নীচু পর্যায়ের অল্পে তুষ্ট। তিনি বলেন, অল্পে তুষ্টির তিনটি স্তর রয়েছে।

(১) দুনিয়ার যৎসামান্য সম্পদে পরিতুষ্ট থেকে বাকী সকল পার্থিব সম্ভার থেকে অন্তরকে নির্মোহ রাখা এবং সম্পদের অধিক্যকে অপসন্দ করা। এটা সর্বোচ্চ পর্যায়ের 'কানা'আত' বা অল্পে তুষ্টি।

(২) যতটুকু সম্পদ প্রয়োজন কেবল ততটুকুতেই ক্ষান্ত থাকা এবং এর অতিরিক্ত সম্পদ ও আধিক্যের লোভ দমন করে রাখা। এটা মধ্যম পর্যায়ের অল্পে তুষ্টি।

(৩) জীবন ধারণের জন্য সম্পদ সমান্য হ'লেও সে ব্যাপারে অভিযোগ না করা। কিন্তু প্রয়োজনের চেয়েও যদি অধিক সম্পদ হস্তগত হয়, তাহ'লে সেটাকে খারাপ মনে না করা। এটা সর্বনিম্ন পর্যায়ের অল্পে তুষ্টি। কেননা এই পর্যায়ে ভয় (رهبة) ও আগ্রহ (رغبة) উভয়ের সংমিশ্রণ ঘটে। আর আগ্রহ হ'ল প্রয়োজনের চেয়ে অধিক সম্পদ প্রাপ্তিকে অপসন্দ না করা'।[২]

অল্পে তুষ্ট না থাকার ক্ষতিকর দিক সমূহ :

অল্পে তুষ্ট লোকেরা নিঃসন্দেহে মহান মানুষ। অল্পে তুষ্ট না থাকলে বিভিন্ন অপকারিতা ও অকল্যাণের সম্মুখীন হ'তে হয়। নিম্নে অল্পে তুষ্ট না থাকার কিছু অপকারিতা তুলে ধরা হ'ল।-

(১) রিযিকে বরকত থাকে না :

আধিক্যের লোভ-লালসায় যারা অন্ধ হয়ে যায়, তারা কখনো অল্পে তুষ্ট থাকতে পারে না। আর অল্পে তুষ্ট না থাকার কারণে আল্লাহ তাদের জীবন-জীবিকা ও রুটি-রূযী থেকে বরকত উঠিয়ে নেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْتَلِي الْعَبْدَ فِيمَا أَعْطَاهُ، فَإِنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَهُ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَوَسَّعَهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى مَا كُتِبَ لَهُ- 'মহান আল্লাহ তার বান্দাকে যা কিছু প্রদান করেন, তা দিয়ে তাকে পরীক্ষা করেন। সুতরাং আল্লাহ তার (বান্দার) জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, সে যদি তাতে খুশী থাকে, তাহ'লে তার রিযিকে বরকত দেওয়া হয় এবং প্রবৃদ্ধি দান করা হয়। আর সে যদি তাতে পরিতৃপ্ত থাকতে না পারে, তাহ'লে তার জীবিকায় কখনো বরকত দেওয়া হয় না এবং তার নির্ধারিত রিযিকে কখনো প্রবৃদ্ধি আসে না'।[৩]

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় ছান'আনী (রহঃ) বলেন, মায়ের পেটে থাকতেই বান্দার জন্য নির্ধারিত রিযিক লিখে দেওয়া হয়। জন্মের পর বান্দা সেই রিযিকে সন্তুষ্ট থাকলে, তার রিযিকে বরকত দিয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আর সে যদি তাতে পরিতুষ্ট না থাকতে পারে, তাহ'লে সে নির্ধারিত রিযিকটুকুই পায়। তা বৃদ্ধিও করা হয় না এবং তাতে বরকতও দেওয়া হয় না।[৪]

(২) ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করা যায় না :

আল্লাহ্র উলূহিইয়াত, রুবূবিইয়াত ও ছিফাতের ব্যাপারে হৃদয়কে পরিতুষ্ট না করা পর্যন্ত ঈমান পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। আর বিদ্বানদের মতে আল্লাহ্র রুবূবিইয়াতে সন্তুষ্ট থাকার অর্থ হ'ল- বান্দার ব্যাপারে আল্লাহ্র যে কোন সিদ্ধান্তে খুশি হওয়া। এজন্য ঈমানের স্বাদ পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন করার অন্যতম প্রধান উপায় হ'ল অল্পে তুষ্টি। অল্পে তুষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ্র রুবূবিইয়াতের স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত ফায়ছালার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়। সুতরাং আল্লাহ্র বণ্টিত রিযিক পেয়েও যারা অভিযোগ করে, বিরক্তি প্রকাশ করে- তারা ঈমানের স্বাদ লাভে ব্যর্থ হয়। আর যারা রাযী-খুশি থাকে তাদের হৃদয় ঈমানের আলোকে আলোকিত হয়। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, أَنَّ مَنْ مَلَأَ قَلْبَهُ مِنَ الرِّضَا بِالْقَدَرِ: مَلَأَ اللهُ صَدْرَهُ غِنًى وَأَمْنًا وَقَنَاعَةً، 'যে ব্যক্তি তাক্বদীরের প্রতি সন্তুষ্টির মাধ্যমে হৃদয়কে পূর্ণ করে, আল্লাহ তার বক্ষকে প্রাচুর্য, নিরাপত্তা ও অল্পে তুষ্টি দিয়ে ভরে দেন'।[৫] ঈমানের স্বাদ আস্বাদনের উপায় বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، 'সে ব্যক্তি

* এম. এ (অধ্যয়নরত), আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. কুরতুবী, ক্বামাউল হিরছি বিয যুহদি ওয়াল ক্বানা'আত, তাহক্বীক্ব: মাজদী সাইয়েদ ইবরাহীম (তানত্বা, মিসর: মাকতাবাতুছ ছাহাবা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮হি./১৯৮৮খ্রি.) ৩/১৮।

২. মাওয়ার্দী, আদাবুদ দুনইয়া ওয়াদ্দীন (লেবানন : দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৮৬ খ্রি.) পৃ: ১২৬-১২৭।

৩. ছহীহুল জামে' হা/১৮৬৯; ছহীহাহ্ হা/১৬৫৮, সনদ ছহীহ।

৪. আত-তানবীর শারহুল জামি'ইছ ছাগীর ৩/৩৬৭।

৫. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন, তাহক্বীক্ব: মুহাম্মাদ মু'তাছিম বিল্লাহ বাগদাদী (বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ৩য় মুদ্রণ, ১৪১৬হি./১৯৯৬খ্রি.) ২/২০২।

ঈমানের স্বাদ পেয়েছে, যে আল্লাহকে রব হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে রাসূল হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে'।[৬]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, الْقَنَاعَةُ تُثْمِرُ الرِّضَاءَ، 'অল্পে তুষ্টির মাধ্যমে রেযামন্দি হাছিল হয়'।[৭] অর্থাৎ অল্পে তুষ্ট থাকার উপহার হ'ল আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভ। একবার ইয়াহইয়া বিন মু'আয (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, مَتَى يَبْلُغُ الْعَبْدُ إِلَى مَقَامِ الرِّضَا؟ 'বান্দা কখন রেযামন্দি বা আল্লাহ্র সন্তুষ্ট লাভের পর্যায়ে পৌঁছে? তখন তিনি বললেন, إِذَا أَقَامَ نَفْسَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أُصُولٍ فِيمَا يُعَامِلُ بِهِ رَبَّهُ، فَيَقُولُ: إِنْ أَعْطَيْتَنِي قَبِلْتُ. وَإِنْ مَنَعْتَنِي رَضِيتُ. وَإِنْ تَرَكْتَنِي عَبَدْتُ. وَإِنْ دَعَوْتَنِي أَجَبْتُ، 'যখন সে আল্লাহ্র সাথে চারটি নীতির ওপর অটল থেকে বলবে, (হে আল্লাহ!) যদি আপনি আমাকে দেন, আমি গ্রহণ করব; যদি দেওয়া থেকে বিরত থাকেন, সন্তুষ্ট থাকব; যদি আমাকে ত্যাগ করেন, তবুও আপনার ইবাদত করব; যদি আমাকে ডাকেন, (আপনার ডাকে) সাড়া দেব'।[৮]

সুতরাং এটা প্রমাণিত যে, যারা অল্পে তুষ্ট থাকে না তারা ঈমানের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হন। আদতে তারা নিজেদেরকে বঞ্চিত করেন। সেজন্য আমাদের কর্তব্য হ'ল- জীবনের যাবতীয় কষ্ট-ক্লেষ, বিপদাপদে আল্লাহ্র ফায়ছালাতে রাযী-খুশি থাকা এবং ধৈর্যধারণ করা। যেমন অসুস্থ ব্যক্তি তিতা ঔষধও সন্তুষ্টচিত্তে সেবন করে ফেলে। ছিয়াম পালনকারী তীব্র গরমের দিনেও ক্ষুৎ-পিপাসার কষ্টে সন্তুষ্ট থাকে। পার্থিব জীবনে আমাদের অবস্থা সেই রকমই হওয়া উচিত।

(৩) আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ :

তাক্বদীরের ভালো-মন্দের প্রতি অবিচল বিশ্বাস রাখা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেকারণ অল্পে তুষ্ট না থাকা তাক্বদীরের প্রতি অসন্তুষ্টির নামান্তর। যারা নির্ধারিত রিযিক পেয়েও অসন্তুষ্ট হয়, আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ، 'নিশ্চয়ই বড় পরীক্ষায় বড় প্রতিদান রয়েছে। আল্লাহ যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন, তখন তাদের পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে ব্যক্তি (সেই পরীক্ষায় নিপতিত হয়ে) সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি তাতে অসন্তুষ্ট হয়, আল্লাহ তার প্রতি নাখোশ হন'।[৯] সুতরাং যারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত রিযিক পেয়ে অসন্তুষ্ট হবে, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হবেন।

৬. মুসলিম হা/৩৪; তিরমিযী হা/২৬২৩; মিশকাত হা/৯।
৭. মাদারিজুস সালেকীন ২/২৯।
৮. মাদারিজুস সালেকীন ২/১৭২।
৯. তিরমিযী হা/২৩৯৬; ইবনু মাজাহ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/১৫৬৬, সনদ হাসান।

(৪) সুখ হারিয়ে যায় :

যারা অল্পে তুষ্ট থাকতে পারে না, তাদের হৃদয় থেকে সুখ উধাও হয়ে যায়। পৃথিবীর তাবৎ সম্পদ তার হস্তগত হ'লেও সে পরিতৃপ্ত হ'তে পারে না। ফলে সে সুখের নাগাল পায় না। কেননা তখন সে মনের দিক থেকে গরীব ও দরিদ্র হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ، وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ، 'ধনের আধিক্য হ'লে ধনী হয় না, অন্তরের ধনীই প্রকৃত ধনী'।[১০]

এই হাদীছে ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম বলেন, لأن النفس بغير القناعة لا تشبع بالمال والعرض ولو ملكت الدنيا، وما دام المرء لم يشبع فإنه يشعر بالضيق والكآبة كأنه لا يملك شيئا، إذن ليس هناك وسيلة لإشباع النفس إلا امتلاك القناعة، 'এর কারণ হ'ল অল্পে তুষ্টি ছাড়া মানুষ সম্পদ ও মালামাল দিয়ে পরিতৃপ্ত হয় না। এমনকি দুনিয়া ভর্তি সম্পদ দিয়েও মানুষ কখনোই তৃপ্ত হয় না। কেননা মানসিক সঙ্কীর্ণতা ও বিষণ্ণতার কারণে তার মনে হয় সে কোন সম্পদের মালিক হ'তে পারেনি। অতএব অল্পে তুষ্টির অধিকারী হওয়া ছাড়া মানুষের পরিতৃপ্তি লাভের কোন উপায় নেই'।[১১] তাই অতৃপ্ত হৃদয় মানুষের জীবন থেকে সুখ ছিনিয়ে নেয়।

(৫) অপমান ও লাঞ্ছনা নেমে আসে :

অল্প তুষ্ট মানুষ সদা সম্মানিত ও প্রশংসিত হয়। কিন্তু অল্পে তুষ্টি বিবর্জিত জীবন সর্বদা অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হয়। পূর্বসূরী বিদ্বানগণ বলেন, عَزَّ مَنْ قَنَعَ ذَلَّ مَنْ طَمِعَ، 'যে ব্যক্তি অল্পে তুষ্ট থাকে, সে সম্মানিত হয় এবং যে লোভ করে, সে লাঞ্ছিত হয়'।[১২] আবূ মুহরিয আত্‌-তুফাওয়ী (রহঃ) বলেন, আমাদের বাড়ির পরিচারিকা আমাকে উপদেশ দিয়ে বলতেন, يا بني استعن بعز القناعة عن ذل المطالب، 'বেটা! চাওয়ার লাঞ্ছনা থেকে নিবৃত্ত হয়ে অল্পে তুষ্টির সম্মানকে তুমি যথেষ্ট মনে করো'।[১৩]

ওলামায়ে কেরাম আরো বলেন, أَطْيَبُ العَيْشِ القَنَاعَةُ وَأَنْكَدُ الْعَيْشِ الجَشَعُ وَمِنْ الأَخْلاقِ الذَّمِيمَةِ التِي تَجْعَلُ الإِنْسَانَ بَخِيلاً بِمَا فِي يَدِهِ مُتَطَلِّعًا لِمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، 'অল্পে তুষ্টি হচ্ছে পবিত্র জীবন এবং লোভ হ'ল দুর্দশার জীবন। আর নিন্দিত চরিত্র তো সেটাই, যা মানুষকে নিজের সম্পদ ব্যয়ে কৃপণ করে তোলে এবং অন্য মানুষের সম্পদের প্রতি আগ্রহী করে তোলে'।[১৪] কবি বলেন,

১০. বুখারী হা/৬৪৪৬; মুসলিম হা/১০৫১; মিশকাত হা/৫১৭০।
১১. মিক্বদাদ মুহাম্মাদ আলী, 'ইলমুল আখলাকিল ইসলামিইয়াহ, (রিয়াদ : দারু 'আলিমিল কুতুব, ২য় মুদ্রণ, ১৪২৪হি./২০০৩খ্রি.) পৃঃ ৯১।
১২. আবূ সাঈদ হানাফী, বুরাইক্বা মাহমূদিইয়াহ (দিমাশ্ক্ব : মাত্বাবা'আতুল হালাবী, ১৩৪৮হি.) ৩/২৩।
১৩. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া, তাহক্বীক্ব : আহমাদ ইবনে আলী (কায়রো: দারুল হাদীছ, ১৪২১হি./২০০০খ্রি.) ২/২৫৮।
১৪. আব্দুল আযীয সালমান, মাওয়ারিদুয যাম্আন, ১/৩০২।

إِنِّي إِذَا ذَلَّ الْحَرِيصُ + عَزَزْتُ فِي ظِلِّ الْقَنَاعَةِ،

'লোভী যখন অপমানিত হয়, তখন আমি অল্পে তুষ্টির ছায়ায় সম্মানিত হয়ে উঠি'।[১৫]

(৬) মানুষ প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয় :

মানুষ যখন দুনিয়ার সম্পদ, ক্ষমতা, মান-সম্মানের প্রতি লোভী হয়, তখন তারা প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়। ছাবিত ইবনু আসলাম (রহঃ) বলেন, الْحُرُّ عَبْدٌ مَا طَمِعَ، وَالْعَبْدُ حُرٌّ مَا قَنِعَ، 'স্বাধীন ব্যক্তি দাস হয়ে থাকে, যতক্ষণ সে লোভে ডুবে থাকে। আর গোলাম স্বাধীনই থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে অল্পে তুষ্ট থাকে'।[১৬] আব্বাসী যুগের কবি আবুল 'আতাহিয়াহ বলেন,

أَطَعْتُ مَطَامِعِي فَاسْتَعْبَدَتْنِي + وَلَوْ أَنِّي قَنِعْتُ لَصِرْتُ حُرًّا،

'আমি আমার লোভ-লালসার আনুগত্য করেছি, ফলে সে আমাকে গোলাম বানিয়েছে। যদি আমি অল্পে তুষ্ট থাকতাম, তাহ'লে আমি স্বাধীন থাকতাম'।[১৭]

ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, فَالْعَبْد لَا بُد لَهُ من رزق وَهُوَ مُحْتَاج إِلَى ذَلِك فَإِذا طلب رزقه من الله صَار عبدا لله فَقِيرا إِلَيْهِ وَإِذا طلبه من مَخْلُوق صَار عبدا لذَلِك الْمَخْلُوق فَقِيرا إِلَيْهِ، 'জীবিকা ছাড়া বান্দা বাঁচতে পারে না। যখন সে আল্লাহ্র কাছে রিযিক তালাশ করে, তখন সে আল্লাহ্রই গোলাম থাকে এবং তাঁরই মুখাপেক্ষী থাকে। কিন্তু যখন সে কোন সৃষ্টির কাছে রিযিক কামনা করে, তখন সে ঐ সৃষ্টির দাসে পরিণত হয় এবং তার দিকে অভাবী ও মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে'।[১৮] সুতরাং অল্পে তুষ্ট থাকলে ক্রীতদাসও স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। পক্ষান্তরে স্বাধীন ব্যক্তি যখন অল্পে তুষ্ট না হয়ে লোভাতুর হয়ে পড়ে, তখন তার মনস্তাত্ত্বিক স্বাধীনতার পরাজয় ঘটে এবং সে প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়। ফলে সে সর্বদা তার কামনা-বাসনা অনুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালনা করতে থাকে।

(৭) মানুষকে হারাম উপার্জনে প্ররোচিত করে :

যখন বান্দা তার স্বল্প উপার্জন নিয়ে পরিতুষ্ট থাকে, তখন আল্লাহ তার সম্পদে বরকত দান করেন এবং তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। কিন্তু বান্দা যখন অল্পে তুষ্ট থাকতে পারে না, তখন যথেষ্ট সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সে আধিক্যের লোভ-লালসায় জড়িয়ে পড়ে এবং সম্পদ বৃদ্ধির বিভিন্ন উপায়-পন্থা তালাশ করতে থাকে। ফলে হালাল-হারাম বিবেচনা না করে সে উপার্জন করতে শুরু করে। তাই কখনো তাকে হারাম পথে আয়-রোজগার করতে হয়। কখনো অল্পে তুষ্ট না থাকা লোভী স্ত্রীর প্ররোচনায় স্বামী হারাম উপার্জনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আবার কখনো নিজেই অর্থলিপ্সায় পড়ে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভিক্ষাবৃত্তিকে দারুণভাবে অপসন্দ করেছেন। তিনি বলেছেন, مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ، 'যে ব্যক্তি সম্পদ বাড়ানোর জন্য মানুষের কাছে সম্পদ ভিক্ষা করে বেড়ায়। মূখ্যত সে জ্বলন্ত অঙ্গার ভিক্ষা করে। কাজেই এখন তার ভেবে দেখা উচিত, সে (আগুনের ফুলকি) বেশী নিবে না কম নিবে'।[১৯]

স্মর্তব্য যে, শুধু রাস্তায় বসে ভাঙ্গা থালা নিয়ে মানুষের কাছে হাত পাতা কিংবা মানুষের দারে দারে গিয়ে হাত পাতার নাম ভিক্ষা নয়; বরং ভিক্ষার বিভিন্ন রকমভেদ আছে। যেমন আমাদের সমাজে কেউ সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও অভাবীর ছদ্মবেশ ধারণ করে, কোন কোন পেশাজীবী যথেষ্ট বেতন পাওয়া সত্ত্বেও টিপ্স, চা-বিস্কুট খাওয়া, বখশিশ, উপরি কামাইয়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন অযুহাতে মানুষের কাছে হাত পাতে বা ভিক্ষা করে। আবার কারো কারো পর্যাপ্ত সম্পদ থাকার পরেও যাকাতের মাল গ্রহণের জন্য অপরের দারস্থ হন। কেউ কেউ ভক্তির চোরাগলি দিয়ে ভক্তের পকেট ছাফ করে ফেলেন। এসব লোকদের জন্য রাসূল (ছাঃ) কঠিন হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন।

(৮) বান্দাকে শাস্তির সম্মুখীন করে :

যারা নিজেদের প্রাপ্ত সম্পদে পরিতুষ্ট থাকতে পারে না, তারা কখনো আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারে না। ফলে তারা আল্লাহ্র নে'মতকে অবজ্ঞা করতে থাকে। আল্লাহ বলেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তাহ'লে আমি আরো বাড়িয়ে দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, (তাহ'লে জেনে রেখ!) নিশ্চয় আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর' *(ইবরাহীম ১৪/১৭)*।

মুফাস্সিরগণ বলেন, বান্দা যদি আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়া আদায় না করে, তাহ'লে আল্লাহ এক পর্যায়ে তার থেকে সেই নে'মত ছিনিয়ে নিবেন এবং তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন'।[২০]

হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا، 'আল্লাহ (তাঁর বান্দাকে) স্বীয় ইচ্ছামত নে'মত উপভোগ করতে দেন। কিন্তু বান্দা এর শুকরিয়া আদায় না করলে তিনি সেই নে'মতকে শাস্তিতে রূপান্তরিত করেন'।[২১] সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি অল্পে তুষ্ট না থাকতে পারে, সে কখনোই আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করতে পারবে না। ফলে এই অকৃতজ্ঞতা ও ধনলিপ্সা তাকে আল্লাহ্র আযাবের দিকে ঠেলে দিবে।

মহান আল্লাহ আমাদের সার্বিক জীবনে অল্পে তুষ্ট থাকার তাওফীক্ব দান করুন এবং অল্পে তুষ্ট না থাকার এই পরিণতিগুলো থেকে হেফাযত করুন-আমীন!

[ক্রমশঃ]

১৫. ইবনুল জাওযী, যাম্মুল হাওয়া, পৃ: ১৪৩।
১৬. আবূ নু'আইম ইস্পাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ১৩/৩২৪।
১৭. ইবনুল মুফলিহ, আল-আদাবুশ শার'ইয়াহ (দিমাশ্ক্ব : মাকতাবাতু 'আলামিল কুতুব, তাবি) ৩/৩০৯।
১৮. ইবনু তায়মিয়াহ, আল-উবূদিয়্যাহ, তাহক্বীক্ব : সা'ঈদ রাসলান (কায়রো : দারুল গাদা আল-জাদীদ, ১ম সংস্করণ, ১৪৩৩হি./২০১২খৃ.) পৃ: ৫৪।
১৯. মুসলিম হা/১০৪১; মিশকাত হা/১৮৩৮।
২০. জামালুদ্দীন ক্বাসেমী, মাহাসিনিত তা'ওয়ীল (তাফসীরে ক্বাসেমী) ৬/৩০১।
২১. ইবনুল ক্বাইয়িম, উদ্দাতুছ ছাবেরীন (মদীনা মুনাওয়ারা : মাকতাবাতু দারিত তুরাছ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪০৯হি./১৯৮৯খৃ.) পৃ: ১২০।

মাসায়েলে কুরবানী

-আত-তাহরীক ডেস্ক

২য় হিজরী সনে ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা বিধিবদ্ধ হয়। ঈদুল আযহার দিন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শারঈ তরীকায় যে পশু যবহ করা হয়, তাকে 'কুরবানী' বলা হয়। সকালের রক্তিম সূর্য উপরে ওঠার সময়ে 'কুরবানী' করা হয় বিধায় এই দিনটিকে 'ইয়াওমুল আযহা' বলা হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত মাসায়েল সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১. যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের ফযীলত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের নেক আমলের চেয়ে প্রিয়তর কোন আমল আল্লাহ্র কাছে নেই। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়? তিনি বললেন, জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তি, যে তার নিজের জান ও মাল নিয়ে বেরিয়েছে, আর ফিরে আসেনি অর্থাৎ আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছে'।[১]

২. চুল-নখ না কাটা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার এরাদা রাখে, তারা যেন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হ'তে বিরত থাকে'।[২] (খ) কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ কুরবানীর খালেছ নিয়তে এটা করলে 'আল্লাহ্র নিকটে তা পূর্ণাঙ্গ কুরবানী' হিসাবে গৃহীত হবে।[৩]

৩. আরাফার দিনের ছিয়াম : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আরাফার দিনের ছিয়াম (যারা আরাফাতের বাইরে থাকেন তাদের জন্য) আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, তা বিগত এক বছরের ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহের কাফফারা হবে'।[৪]

৪. ঈদায়নের তাকবীর ধ্বনি : এটি 'ঈদের নিদর্শন' *(আল-মুগনী ২/২৫৬)*। ৯ই যিলহজ্জ ফজর থেকে ১৩ই যিলহজ্জ আইয়ামে তাশরীক্ব-এর শেষ দিন আছর পর্যন্ত ২৩ ওয়াক্ত ছালাত শেষে দুই বা তিন বার করে ও অন্যান্য সময়ে উচ্চকণ্ঠে তাকবীর ধ্বনি করা সুন্নাত *(নায়েল ৪/২৭৮)*। ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়া থেকে খুৎবা শুরুর আগ পর্যন্ত তাকবীর ধ্বনি করবে। ইমাম তাকবীর দিলে তারাও তাকবীর দিবে *(ইরওয়া হা/৬৪৯-৫৪, ৩/১২১-২৫)*।

৫. তাকবীরের শব্দাবলী : ইমাম মালেক ও আহমাদ (রহঃ) বলেন, তাকবীরের শব্দ ও সংখ্যার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। হযরত ওমর, আলী, ইবনু মাসঊদ, ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ তাকবীর দিতেন 'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু; ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ'।[৫] এছাড়া 'আল্লা-হু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুবহানাল্লা-হি বুকরাতাঁও ওয়া আছীলা'। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এটাকে 'সুন্দর' বলেছেন। *(যা-দুল মা'আদ ২/৩৬০-৬১ পৃ.)*।

৬. ঈদায়নের সময়কাল : ঈদুল আযহায় সূর্য এক 'নেযা' পরিমাণ ও ঈদুল ফিৎরে দুই 'নেযা' পরিমাণ অর্থাৎ সাড়ে ছয় হাত উপরে *(মির'আত ৫/৬২)* উঠার পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ছালাত আদায় করতেন। অতএব ঈদুল আযহার ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই যথাসম্ভব দ্রুত শুরু করা উচিত।

৭. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে বেজোড় সংখ্যক খেজুর বা অন্য কিছু না খেয়ে ঈদগাহে বের হ'তেন না এবং ঈদুল আযহার দিন ছালাত শেষে ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না।[৬] তিনি স্বীয় কুরবানীর গোশত দ্বারা ইফতার করতেন *(আহমাদ হা/২৩০৩৪)*। বায়হাক্বীর বর্ণনায় নির্দিষ্টভাবে 'কলিজা'র কথা এসেছে, তবে তা যঈফ।[৭]

৮. মহিলাদের ঈদের ছালাত : (ক) ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। উম্মে 'আতিয়া (রাঃ) বলেন, 'আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হ'ল, যেন আমরা ঋতুবতী ও পর্দানশীন মহিলাদেরকে দুই ঈদের দিন বের করে নিয়ে যাই। যেন তারা মুসলমানদের জামা'আতে ও দো'আয় শরীক হ'তে পারে। তবে ঋতুবতী মহিলারা একদিকে সরে বসবেন। জনৈকা মহিলা বললেন, আমাদের অনেকের বড় চাদর নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার সাথী তাকে নিজের চাদর দ্বারা আবৃত করে নিয়ে যাবে'।[৮] সেখানে ঋতুবতীরা ছালাত ব্যতীত সবকিছুতে শরীক হবেন। **(খ)** পুরুষদের জামা'আতে শরীক হওয়া অসম্ভব বিবেচিত হ'লে মহিলাগণ ঘরে একাকী বা নিজেদের ইমামতিতে জামা'আত সহকারে ঈদের ছালাত আদায় করায় কোন বাধা নেই। বরং তারা এতে অধিক ছওয়াবের অধিকারী হবেন।[৯]

৯. সম্মিলিত দো'আ নয় : মিশকাতের আরবী ভাষ্যকার ছাহেবে মির'আত বলেন, হাদীছের শেষে বর্ণিত 'ওয়া দা'ওয়াতাল মুসলিমীন' অর্থাৎ মুসলমানদের দো'আয় শরীক হওয়া কথাটি 'আম। এর দ্বারা ইমামের খুৎবা, যিকর ও নছীহত শ্রবণে শরীক হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাত শেষে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করার পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন প্রমাণ নেই।[১০]

১০. ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর : প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পর ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে উঠে ছালাতের তাকবীর শেষে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বারো তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।

---

১. বুখারী হা/৯৬৯; মিশকাত হা/১৪৬০।
২. মুসলিম হা/১৯৭৭; মিশকাত হা/১৪৫৯।
৩. আহমাদ হা/৬৫৭৫; আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৭৯; মির'আত হা/১৪৯৩, ৫/১১৭ পৃ.।
৪. মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ।
৫. ইরওয়া ৩/১২৫; মির'আত ৫/৭০।
৬. বুখারী হা/৯৫৩; মিশকাত হা/১৪৩৩; তিরমিযী হা/৫৪২; ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৬; মিশকাত হা/১৪৪০।
৭. বায়হাক্বী ৩/২৮৩; সুবুলুস সালাম হা/৪৫৪-এর আলোচনা।
৮. বুখারী হা/৯৮১; মুসলিম হা/৮৯০; মিশকাত হা/১৪৩১।
৯. বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ক্রমিক ১৯৯, ৩০/২৭৭ পৃ.।
১০. বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৪৩১; মির'আত হা/১৪৪৫-এর আলোচনা, ৫/৩১ পৃ.।

প্রচলিত নিয়মে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই।

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও মুজতাহিদ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[১১]

ছয় তাকবীরের অবস্থা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'ছয় তাকবীরে' ঈদের ছালাত আদায় করেছেন- মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন স্পষ্ট মরফূ হাদীছ নেই। 'জানাযার তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর' বলে মিশকাতে।[১২] এবং ৫+৪ 'নয় তাকবীর' বলে মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাকে *(হা/৫৬৮৫, ৫৬৮৯)* ও মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাতে *(হা/৫৭৪৬-৪৭)* ইবনু আব্বাস, মুগীরা বিন শো'বাহ ও ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে যে আছারগুলি এসেছে সবই যঈফ।[১৩] এ বিষয়ে ইমাম বায়হাক্বী বলেন, 'এটি আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর 'ব্যক্তিগত রায়' মাত্র। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত মরফূ হাদীছ, যার উপরে মুসলমানদের আমল জারী আছে (অর্থাৎ বারো তাকবীর) তার উপরে আমল করাই উত্তম'।[১৪]

ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, 'জানাযার চার তাকবীরের ন্যায়' মর্মের বর্ণনাটি যদি 'ছহীহ' বলে ধরে নেওয়া হয়[১৫], তথাপি এর মধ্যে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ সেখানে ১ম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে চার ও ২য় রাক'আতে ক্বিরাআতের পরে চার তাকবীর দিতে হবে বলে কোন কথা নেই। বরং এটাই স্পষ্ট যে, দুই রাক'আতেই জানাযার ছালাতের ন্যায় চারটি করে (আটটি অতিরিক্ত) তাকবীর দিতে হবে'।[১৬]

১১. ঈদায়নের ছালাত আদায়ের পদ্ধতি : ওযূ সহ ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবর' বলে তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে বাম হাতের উপরে ডান হাত বুকের উপরে বাঁধবে। অতঃপর 'ছানা' পড়বে। অতঃপর 'আল্লাহু আকবর' বলে ধীর-স্থিরভাবে দুই তাকবীরের মাঝে স্বল্প বিরতিসহ পরপর সাতটি তাকবীর দিবে। প্রতি তাকবীরে হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে, অতঃপর পূর্বের ন্যায় বুকে বাঁধবে। তাকবীর শেষ হ'লে প্রথম রাক'আতে আ'ঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পূর্ণভাবে পড়ে ইমাম হ'লে সরবে সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। মুক্তাদী হ'লে নীরবে কেবল সূরা ফাতেহা ইমামের পিছে পিছে পড়বে ও ইমামের ক্বিরাআত শুনবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে পূর্বের নিয়মে ধীর-স্থিরভাবে দুই তাকবীরের মাঝে স্বল্প বিরতিসহ পরপর পাঁচটি তাকবীর দিবে। তারপর 'বিসমিল্লাহ' পাঠ অন্তে সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে।

ঈদায়নের ছালাতে ১ম ও ২য় রাক'আতে যথাক্রমে সূরা আ'লা ও গাশিয়াহ অথবা সূরা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত। ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়। এর আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা এক্বামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীর ধ্বনি ব্যতীত কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করাও ঠিক নয়।

১২. একটি খুৎবাই সুন্নাত : ছহীহ হাদীছ সমূহের বর্ণনা মতে ঈদায়নের খুৎবা মাত্র একটি।[১৭] মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে ইবনু মাজাহ *(হা/১২৮৯)* ও বাযযারে *(হা/১১১৬)* কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ এসেছে, যা ছহীহ হাদীছ সমূহের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য নয়। ছাহেবে সুবুলুস সালাম ও ছাহেবে মির'আত বলেন, 'প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে। এটি রাসূল (ছাঃ)-এর 'আমল' দ্বারা এবং কোন নির্ভরযোগ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়'।[১৮]

ছালাতের পর খুৎবা শোনা সুন্নাত। যারা কারণ ছাড়াই খুৎবা না শুনে চলে যান, তারা খুৎবা শোনার ছওয়াব ও বরকত থেকে মাহরূম হন।

১৩. কুরবানী করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ : এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানা হ'তে অদ্যাবধি মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে 'সুন্নাতে ইব্রাহীমী' হিসাবে প্রচলিত।[১৯] এটি ইসলামের অন্যতম 'মহান নিদর্শন' *(মির'আত ৫/৭৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে প্রতি বছর কুরবানী করেছেন এবং ছাহাবীগণও নিয়মিতভাবে কুরবানী করেছেন *(মির'আত ৫/৭১, ৭৩ পৃ.)*। তিনি বলেন, 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়'।[২০] এটি সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। এটি ওয়াজিব নয় যে, যেকোন মূল্যে প্রত্যেককে কুরবানী করতেই হবে। লোকেরা যাতে এটাকে ওয়াজিব মনে না করে, সেজন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হযরত আবুবকর ছিদ্দীক, ওমর ফারূক, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, বেলাল, আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ কখনো কখনো কুরবানী করতেন না।[২১]

১৪. কুরবানীর সময়কাল : ঈদুল আযহার ছালাত ও খুৎবা শেষ হওয়ার পূর্বে কুরবানী করা নিষিদ্ধ। করলে তাকে তদস্থলে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।[২২] অতঃপর ১১,

---

১১. মির'আত শরহ মিশকাত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা, ৫/৪৬, ৫১, ৫২ পৃ.।
১২. আবুদাঊদ হা/১১৫৩; মিশকাত হা/১৪৪৩, এবং ঐ তাখরীজ-আলবানী, হেদায়াতুর রুওয়াত হা/১৩৮৮, ২/১২১ পৃ., হাদীছ যঈফ।
১৩. তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী 'ঈদায়নের তাকবীর' অনুচ্ছেদ হা/৫৩৪-এর আলোচনা, ৩/৮০-৮৮ পৃ.।
১৪. বায়হাক্বী ৩/২৯১; মির'আত ৫/৫১।
১৫. আবু দাঊদ হা/১১৫৩; মিশকাত হা/১৪৪৩; ছহীহাহ হা/২৯৯৭।
১৬. ইবনু হায্ম, মুহাল্লা মাসআলা ক্রমিক : ৫৪৩, ৫/৮৪-৮৫ পৃ.।
১৭. বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৪২৬, ১৪২৯।
১৮. সুবুলুস সালাম ১/১৪০; মির'আত ৫/২৭।
১৯. ইবনু মাজাহ হা/৩১২৭; মিশকাত হা/১৪৭৬।
২০. ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩।
২১. মির'আত ৫/৭১-৭৩ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদের আলোচনা দ্র.।
২২. বুখারী হা/৫৫৬২; মুসলিম হা/১৯৬০; মিশকাত হা/১৪৭২।

১২, ১৩ই যিলহজ্জ আইয়ামে তাশরীক্বের তিনদিনে রাত-দিন যেকোন সময় কুরবানী করা যাবে *(মির'আত ৫/১০৬ পৃ.)*।

১৫. কুরবানীর পশু : এটা তিন প্রকার- ছাগল, গরু ও উট। দুম্বা ও ভেড়া ছাগলের মধ্যে গণ্য। প্রত্যেকটির নর ও মাদি।[২৩] এগুলির বাইরে অন্য কোন পশু দিয়ে কুরবানী করার কোন প্রমাণ নেই। কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁৎ হ'তে হবে। চার ধরনের পশু কুরবানী করা নাজায়েয। স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণশীর্ণ এবং অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা ও অর্ধেক শিং ভাঙ্গা।[২৪] তবে নিখুঁৎ পশু ক্রয়ের পর যদি নতুন করে খুঁৎ হয় বা পুরানো কোন দোষ বেরিয়ে আসে, তাহ'লে ঐ পশু দ্বারাই কুরবানী বৈধ হবে' *(মির'আত ৫/৯৯)*। উল্লেখ্য যে, খাসি করা কোন খুঁৎ নয়। বরং এতে পাঁঠা ছাগলের দুর্গন্ধ দূর হয় এবং গোশত রুচিকর হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে দু'টি মোটাতাজা খাসি দিয়ে কুরবানী করেছেন।[২৫]

১৬. 'মুসিন্নাহ' পশু দ্বারা কুরবানী : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ করো না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার'।[২৬] জমহূর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে এই হাদীছে নির্দেশিত 'মুসিন্নাহ' পশুকে কুরবানীর জন্য 'উত্তম' বলেছেন *(মির'আত ৫/৮০ পৃ.)*। 'মুসিন্নাহ' পশু ষষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী উট এবং তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু বা দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী ছাগল-ভেড়া-দুম্বাকে বলা হয় *(মির'আত ৫/৭৮-৭৯ পৃ.)*। কেননা এই বয়সে সাধারণতঃ এই সব পশুর দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে অনেক পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত ওঠে না। এসব পশু দ্বারা কুরবানী করা ইনশাআল্লাহ কোন দোষের হবে না।

১৭. নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি পশু যথেষ্ট : (ক) মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিংওয়ালা সুন্দর সাদা-কালো দুম্বা আনতে বললেন, ...অতঃপর নিম্নোক্ত দো'আ পড়লেন, -'আল্লাহ্‌র নামে (কুরবানী করছি), হে আল্লাহ! তুমি এটি কবুল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও তার উম্মতের পক্ষ হ'তে'। এরপর উক্ত দুম্বা দ্বারা কুরবানী করলেন'।[২৭] আলবানী বলেন, 'এর অর্থ কুরবানীর ছওয়াবে উম্মতকে শরীক করা। কেননা সকল বিদ্বানের ঐক্যমতে একটি ছাগল একটি পরিবারের বেশী অন্যদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট নয়'।[২৮] **(খ)** আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় কুরবানীর রীতি কি ছিল? জওয়াবে তিনি বলেন, ছাহাবীগণ নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি বকরী কুরবানী দিতেন। অতঃপর নিজেরা খেতেন ও অন্যদের খাওয়াতেন। এমনকি লোকেরা বড়াই করত। সেই রীতি চলছে যেমন তুমি দেখছ।[২৯] **(গ)** ধনাঢ্য ছাহাবী আবু সারীহা (রাঃ) বলেন, সুন্নাত জানার পর লোকেরা পরিবারপিছু একটি বা দু'টি করে বকরী কুরবানী দিত। অথচ এখন প্রতিবেশীরা আমাদের কৃপণ বলছে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৮)*। **(ঘ)** বিদায় হজ্জে আরাফার দিন সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের উপর প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ'। আবুদাঊদ (রহঃ) বলেন, রজব মাসের 'আতীরাহ' প্রদানের হুকুম পরে রহিত করা হয়।[৩০] আর 'কুরবানী' অর্থ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ঈদুল আযহার দিন যে পশু যবহ করা হয়।[৩১] অতএব একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য সংখ্যা যত বেশীই হৌক না কেন, সকলের পক্ষ থেকে একটি পশুই যথেষ্ট। এক পিতার সন্তান হ'লেও পৃথকান্ন হ'লে তারা পৃথক পরিবার হিসাবে গণ্য হবেন। তবে তারা পৃথক কুরবানীর জন্য পিতাকে অর্থ সাহায্য করতে পারেন।

১৮. কুরবানীতে শরীক হওয়া : (ক) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা সাত জনে একটি গরু ও দশ জনে একটি উটে শরীক হ'লাম।[৩২] **(খ)** হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা (৬ষ্ঠ হিজরীতে) হোদায়বিয়ার সফরে প্রতি সাত জনে একটি উট ও গরু কুরবানী করি'।[৩৩] **(গ)** তিনি বলেন, 'আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে হজ্জের সফরে ছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে একটি গরু ও উটে সাতজন করে শরীক হওয়ার নির্দেশ দেন'।[৩৪]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহে বুঝা যায় যে, সফরে সাতজনে মিলে একটি উট বা গরু কুরবানী করা যায়। যাতে এইসব বড় পশু যবহ ও কুটাবাছা এবং গোশত বিতরণ সহজ হয়। এটি উম্মতের জন্য রহমত স্বরূপ। সেকারণ লায়েছ বিন সা'দ (রহঃ) উট বা গরুতে শরীকানা কুরবানীর বিষয়টি সফরের সাথে 'খাছ' বলেছেন।[৩৫] যদিও জমহূর ওলামায়ে কেরাম হজ্জের সময় উট বা গরুতে শরীকানা কুরবানীর উপর ক্বিয়াস করে বাড়ীতে ও সফরে সর্বাবস্থায় শরীকানা কুরবানী জায়েয বলেছেন। কিন্তু ইমাম মালেক (রহঃ) একে নাজায়েয বলেছেন *(মির'আত ৫/৮৫)*। কেননা জাবের (রাঃ) বর্ণিত 'একটি গরু বা উট সাত জনের পক্ষ হ'তে'।[৩৬] হাদীছটি মুৎলাক্ব। যেখানে বাড়ীতে বা সফরে বলে কোন ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু একই রাবীর বর্ণিত আবুদাঊদ ২৮০৭ ও ২৮০৯ নম্বর

---

২৩. আন'আম ৬/১৪৩-৪৪; হজ্জ ২২/৩৪।
২৪. তিরমিযী হা/১৪৯৭ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৬৫।
২৫. ইবনু মাজাহ হা/৩১২২; ইরওয়া হা/১১৩৮, ৪/৩৫১ পৃ.; মিশকাত হা/১৪৬১; মির'আত হা/১৪৭৬, ৫/৯১-৯২ পৃ.।
২৬. মুসলিম হা/১৯৬৩; মিশকাত হা/১৪৫৫।
২৭. মুসলিম হা/১৯৬৭; মিশকাত হা/১৪৫৪; মির'আত ১/৭৬।
২৮. মিশকাত হা/১৪৫৪-এর টীকা।
২৯. তিরমিযী হা/১৫০৫; ইবনু মাজাহ হা/১৩৪৭; ইরওয়া হা/১১৪২, ৪/৩৫৫ পৃ.।
৩০. তিরমিযী হা/১৫১৮; আবুদাঊদ হা/২৭৮৮ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৭৮; মির'আত ৫/১১৪-১৫।
৩১. মির'আত ৫/৭১; হজ্জ ২২/৩৪।
৩২. তিরমিযী হা/৯০৫; নাসাঈ হা/৪৩৯২ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৬৯; মির'আত হা/১৪৮৪, ৫/১০১-২ পৃ.।
৩৩. মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫০)।
৩৪. মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫১)।
৩৫. মুহাল্লা, মাসআলা ক্রমিক : ৯৮৪, ৬/৪৫।
৩৬. আবুদাঊদ হা/২৮০৮; মিশকাত হা/১৪৫৮।

হাদীছে এটি হজ্জ ও হোদায়বিয়ার সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে ব্যাখ্যা এসেছে। অতএব দলীলের ক্ষেত্রে একই রাবীর বর্ণিত ব্যাখ্যাশূন্য হাদীছের স্থলে ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীছ গ্রহণ করাই মুহাদ্দিছগণের সর্ববাদী সম্মত রীতি।

অনেকে ৭-এর বদলে ৩, ৫, ১০ ভাগে কুরবানী করেন, যা প্রমাণহীন। অনেকে পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল দেন, আবার একটি গরুর ভাগা নেন। অনেকে বকরী বা খাসী না দিয়ে বড় গরুতে ভাগী হন, মূলতঃ গোশত বেশী পাবার জন্য। 'নিয়ত' যখন গোশত খাওয়া, তখন কুরবানীর নেকী তিনি কিভাবে পাবেন? অথচ প্রতি বছর ঈদুল আযহাতে একটি পশু কুরবানী করাই হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর সাধারণ নির্দেশনা।[৩৭] অতএব মুক্বীম অবস্থায় প্রতি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করাই উত্তম।

১৯. কুরবানীর সাথে আক্বীক্বা : 'দু'টিরই উদ্দেশ্য আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা' এই (ইসতিহসানের) যুক্তি দেখিয়ে কোন কোন হানাফী বিদ্বান কুরবানীর গরু বা উটে এক বা একাধিক সন্তানের আক্বীক্বা সিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন (যা এদেশে অনেকের মধ্যে চালু আছে)।[৩৮] হানাফী মাযহাবের স্তম্ভ বলে খ্যাত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এই মতের বিরোধিতা করেন। ইমাম শাওকানী (রহঃ) এর ঘোর প্রতিবাদ করে বলেন, এটি শরী'আত, এখানে সুনির্দিষ্ট দলীল ব্যতীত কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়।[৩৯]

২০. কুরবানী করার পদ্ধতি : (ক) উট দাঁড়ানো অবস্থায় এর 'হলকূম' বা কণ্ঠনালীর গোড়ায় কুরবানীর নিয়তে 'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লাহু আকবার' বলে তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করে 'নহর' করতে হয় এবং গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে 'যবহ' করতে হয়। তবে বাম কাতে ফেলতে ভুলে গেলে দোষের কিছু হবে না *(মির'আত ৫/৭৫)*। কুরবানী দাতা ধারালো ছুরি নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দো'আ পড়ে নিজ হাতে খুব জলদি যবহের কাজ সমাধা করবেন, যেন পশুর কষ্ট কম হয়। অন্যের দ্বারাও যবহ করানো জায়েয আছে। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি নিজ হাতে করা অথবা যবহের সময় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা উত্তম *(মির'আত ৫/৭৪)*।

২১. যবহকালীন দো'আ : (১) বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার (অর্থ: আল্লাহ্র নামে কুরবানী করছি, আল্লাহ সবার চাইতে বড়) (২) বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী (আল্লাহ্র নামে, হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এখানে কুরবানী অন্যের হ'লে তার নাম মুখে বলবেন অথবা মনে মনে নিয়ত করে বলবেন, 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন ফুলান ওয়া মিন আহলে বায়তিহী' (...অমুকের ও তার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। (৩) যদি দো'আ ভুলে যান বা ভুল হবার ভয় থাকে, তবে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলে মনে মনে কুরবানীর নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে *(মির'আত ৫/৭৬)*।

৩৭. *আবুদাউদ হা/২৭৮৮ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৭৮; মির'আত হা/১৪৯২, ৫/১১৪ পৃ.।*
৩৮. *হেদায়া ৪/৪৩৩; বেহেশ্তী জেওর 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ১/৩০০ পৃ.।*
৩৯. *নায়লুল আওত্বার, 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ৬/২৬৮ পৃ.।*

২২. গোশত বণ্টন : কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজ পরিবারের জন্য, এক ভাগ প্রতিবেশী যারা কুরবানী করতে পারেননি তাদের জন্য ও এক ভাগ সায়েল ফক্বীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে। প্রয়োজনে উক্ত বণ্টনে কমবেশী করায় কোন দোষ নেই *(মির'আত ৫/১২০)*। কুরবানীর গোশত যত দিন খুশী রেখে খাওয়া যায়।[৪০] অমুসলিম দরিদ্র প্রতিবেশীকেও দেওয়া যায় *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২৮)*।

২৩. মৃত ব্যক্তির জন্য পৃথকভাবে কুরবানী দেওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই। যদি কেউ সেটা করেন, তবে বিখ্যাত তাবেঈ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, তাকে সবটুকুই ছাদাক্বা করে দিতে হবে *(মির'আত ৫/৯৩ পৃ.)*।

২৪. কুরবানীর গোশত ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।[৪১] তবে তার চামড়া বিক্রি করে শরী'আত নির্দেশিত ছাদাক্বার খাত সমূহে দান করবে।[৪২] অনেকে কুরবানীর গোশত ফ্রিজে জমা করে পরবর্তীতে সাধারণ গোশত হিসাবে বিক্রি করেন। এগুলি প্রতারণা মাত্র। বরং তা ছওয়াবের আশায় অন্যদের মধ্যে ছাদাক্বা বা হাদিয়া হিসাবে বিতরণ করে দিতে হবে। অথবা নিজে রেখে যতদিন খুশী খাবে। তবে এলাকায় অভাব থাকলে তিনদিন পর সবটুকু বিতরণ করে দিবে।[৪৩]

অতএব সরকার, সংস্থা বা সামর্থ্যবানদের উচিত বন্যাদুর্গত বা দুর্ভিক্ষ এলাকায় বেশী বেশী কুরবানী বিতরণ করা। যাতে তারা কুরবানীর আনন্দে শরীক হ'তে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের সময় ১০০ উট কুরবানী করে বিতরণ করেছিলেন।[৪৪] এছাড়া অন্য সময় তিনি ছাহাবীদের মধ্যে কুরবানীর পশু বণ্টন করতেন।[৪৫]

২৫. কুরবানীর পশু যবহ করা কিংবা কুটা-বাছা বাবদ কুরবানীর গোশত বা চামড়ার পয়সা হ'তে কোনরূপ মজুরী দেওয়া যাবে না। ছাহাবীগণ নিজ নিজ পকেট থেকে এই মজুরী দিতেন।[৪৬] অবশ্য ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই।[৪৭]

২৬. কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করা নাজায়েয। কেননা আল্লাহ্র রাহে রক্ত প্রবাহিত করাই এখানে মূল ইবাদত। এটা না করলে তিনি ইসলামের একটি 'মহান নিদর্শন' পরিত্যাগের প্রতি ধাবিত হবেন *(মির'আত ৫/৭৩)*। যদি কেউ কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করতে চান, তবে তিনি মুহাম্মাদী শরী'আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা করবেন।

[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই, প্রকাশকাল : ১৪৪২ হি./২০২১ খৃ.]।

৪০. *তিরমিযী হা/১৫১০; আহমাদ হা/২৬৪৫৮।*
৪১. *আহমাদ হা/১৬২৫৫-৫৬; মির'আত ৫/১২১।*
৪২. *মির'আত ৫/১২১; তওবা ৯/৬০।*
৪৩. *বুখারী হা/৫৫৬৯; মুসলিম হা/১৯৭৪; মিশকাত হা/২৬৪৪।*
৪৪. *মুসলিম হা/১২১৮ (১৪৭); মিশকাত হা/২৫৫৫।*
৪৫. *বুখারী হা/২৫০০; মুসলিম হা/১৯৬৫; মিশকাত হা/১৪৫৬; মির'আত ৫/৮২।*
৪৬. *মুসলিম হা/১৩১৭; বুখারী হা/১৭১৭; মিশকাত হা/২৬৩৮।*
৪৭. *বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২৬৩৮; মির'আত হা/২৬৬২-এর আলোচনা, ৯/২৩০ পৃ.।*

ইস্রাঈলের সঙ্গে অঘোষিত সম্পর্ক কেন অনুচিত

-কামাল আহমাদ

স্বদেশ ছাড়াও অন্য আরেকটি দেশের মুক্তির জন্য সরাসরি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের গৌরবের অধিকারী হিসাবে বাংলাদেশীদের একটা আলাদা ও অনন্য অবস্থান রয়েছে। কোন ভাড়াটে সেনা হিসাবে নয়, কিংবা কোন রাষ্ট্রীয় অনুরোধেও নয়। দখলদারী থেকে একটি জাতির মুক্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের লড়াইয়ের প্রতি রাজনৈতিক উপলব্ধি ও সংহতি থেকেই ছিল অসামরিক নাগরিকদের এই ঐতিহাসিক অংশগ্রহণ। সেই দ্বিতীয় রাষ্ট্রটি হচ্ছে ফিলিস্তীন। আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের অল্প পরেই বাংলাদেশ থেকে হাযারে হাযারে তরুণ ইস্রাঈলী দখলদারী থেকে ফিলিস্তীনের মুক্তির লড়াইয়ে অংশ নিয়ে বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস রচনা করেছেন।

মিসরের আল-আখবার পত্রিকার ইংরেজী সংস্করণে ২০১৪ সালের এক নিবন্ধে এ সম্পর্কে দু'টি হিসাব পাওয়া যায়। ফিলিস্তীনী মুক্তি সংস্থা, পিএলওর প্রধান অংশ ফাতাহ্র লেবানন শাখার সম্পাদক ফাতি আবু আল-আরাদাতের ভাষ্য অনুযায়ী বিভিন্ন ইউনিটে ছড়িয়ে থাকা ছাড়াও শুধু বাংলাদেশী যোদ্ধাদের একটা আলাদা ব্যাটালিয়নও ছিল। পত্রিকাটি ১৯৮৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের সূত্র উল্লেখ করে বলছে, তাদের হিসাবে প্রায় ৮ হাযার বাংলাদেশী ফিলিস্তীনীদের জন্য লড়াই করেছেন। কিন্তু সেই ফিলিস্তীন এখনো দখলমুক্ত হয়নি, বরং বহুগুণ বেশি যমীন খুইয়েছে। সেই বাংলাদেশী তরুণেরা ফিরে এসেছে। এখন আর সেই লড়াইয়ে ভিনদেশীদের অংশগ্রহণের কথা শোনা যায় না।

দুঃখজনক খবর হচ্ছে, সেই ফিলিস্তীন মুক্ত না হ'লেও সেখানে যাদের দখলদারী ক্রমেই বেড়েছে ও নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুরতর হয়েছে, সেই ইস্রাঈলের সঙ্গে অঘোষিত সম্পর্কের সূচনা হয়েছে। শেয়ারবিজ নামের এক অর্থনৈতিক দৈনিকে গত ৩০শে মে প্রকাশিত খবরে জানা যাচ্ছে বাংলাদেশের সামান্য কিছু রফতানী দেশটিতে পাঠানোর মাধ্যমে এই কাজ শুরু হয়েছে ঠিক ১০ বছর আগে। তবে পত্রিকাটি বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশীকে উদ্ধৃত করে বলেছে, কীভাবে ও কী পরিমাণ পণ্য বাংলাদেশ থেকে রফতানী হয় তা তিনি জানেন না। পত্রিকাটির তথ্যের উৎস হচ্ছে সরকারের প্রতিষ্ঠান রফতানী উন্নয়ন ব্যুরো, যাদের কাছে প্রতিটি রফতানীর বিবরণ সংরক্ষিত থাকে। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছেও এই রফতানীর হিসাব থাকার কথা। সরকারী নথিপত্রে ইস্রাঈলের সঙ্গে বাণিজ্যের তথ্য থাকলেও তা সরকারের মন্ত্রীদের না জানার ব্যাখ্যা কী হ'তে পারে, তা নিয়ে কোন জল্পনা না করাই ভালো।

রফতানী উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য বলছে, প্রথম কয়েক বছর গেছে শুধু তৈরি পোশাক। আর গত বছর তিনেক ধরে যাচ্ছে যক্ষ্মা ও কুষ্ঠরোগের মতো অসুখের প্রতিষেধক টিকা। সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে মোটরসাইকেল। বাংলাদেশ পোশাক রফতানীকারকের সংখ্যা হাযারের বেশি হ'লেও টিকা ও মোটরসাইকেল রফতানী করার ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই কম। ধারণা করি, অচিরেই তাদের পরিচয়ও প্রকাশ পাবে। বাংলাদেশী পাসপোর্ট থেকে হঠাৎ করে 'ইস্রাঈল ব্যতীত' কথা দু'টো তুলে দেওয়ার পর আমরা ধারণা করেছিলাম হয়তো ব্যবসায়িক স্বার্থ ও বিবেচনা এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রেখে থাকতে পারে। তাইওয়ানের বেলাতেও এমনটিই ঘটেছে। শুধু বাণিজ্যিক সুবিধা লাভের আশায় সরকারকে প্রভাবিত করে প্রায় দুই দশক আগেই পাসপোর্টের 'ব্যতীত তালিকা' থেকে তাইওয়ানকেও কোনো ধরনের ঘোষণা ছাড়াই বাদ দেওয়া হয়। তাইওয়ানকে আলাদা রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া বা তার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রশ্নে চীন একটা বড় বাধা এবং সেই স্পর্শকাতরতার কারণেই বাংলাদেশের পাসপোর্ট দেশটির জন্য বৈধ নয় বলে ঘোষণা দেওয়া হ'ত।

শেয়ারবিজ-এর প্রতিবেদন এবং প্রথম আলো অনলাইনে সাংবাদিক আসজাদুল কিবরিয়ার নিবন্ধ সূত্রে এখন নিশ্চিত হওয়া গেল যে, ইস্রাঈলের সঙ্গে বাংলাদেশের সরাসরি বাণিজ্যিক লেনদেন চলছে। আসজাদুল কিবরিয়া বিশ্বব্যাংকের ওয়ার্ল্ড ইন্টিগ্রেটেড ট্রেড সলিউশন (ডব্লিউআইটিএস) তথ্যভাণ্ডারের উপাত্ত উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন যে, ইপিবির হিসাবের চেয়ে প্রকৃত রফতানীর পরিমাণ কয়েক গুণ বেশি। গত ১০ বছরে আসলে রফতানী হয়েছে ৩৩ কোটি ডলারের এবং আমদানী হয়েছে ৩৭ লাখ ডলারের ইস্রাঈলী পণ্য। এসব উপাত্ত থেকে আরও নিশ্চিত হওয়া যায় করোনা মহামারির আগে ২০১৮ সালে বাণিজ্যে বেশ বড় ধরনের উল্লম্ফন ঘটেছে। তিনি অবশ্য বলেছেন যে, বিশ্বায়নের কালে বাণিজ্য আটকে রাখা সম্ভব নয়, বড়যোর সীমিত করে রাখা সম্ভব। আর যদি চাহিদা থাকে, তাহ'লে সোজা পথে না পারলে ঘুরপথে পণ্যের আসা-যাওয়া চলবে।

বিশ্বায়নের কালে বাণিজ্য সম্পর্কে আসজাদুল কিবরিয়ার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু সম্ভব নয় কথাটা ঠিক নয়। ইরান, উত্তর কোরিয়ার প্রতি চলমান নিষেধাজ্ঞার কথা ভুলে গেলে চলবে না। মূলতঃ বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইস্রাঈল যাতে একঘরে না হয়ে পড়ে, সেজন্য তারা যে কতটা মরিয়া তার সাক্ষ্য বহন করে বয়কট, ডাইভেস্টমেন্ট এবং স্যাঙ্কশন (বিডিএস) নামে পরিচিত বৈশ্বিক আন্দোলন। এক দশক ধরে এই আন্দোলন তাদের এতটাই চাপের মধ্যে ফেলেছে ও উদ্বিগ্ন করে তুলেছে যে তারা এই আন্দোলনকেও ইহুদিবিদ্বেষী হিসাবে অভিহিত করে তা নিষিদ্ধ করার জন্য পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে যোর কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে আসছে। এই পটভূমিতে যুক্তরাষ্ট্র ২০১৯ সালে ইস্রাঈলকে বর্জনের পদক্ষেপ আইন করে নিষিদ্ধ করেছে। ইউরোপের আরও কিছু দেশও এটি করার কথা ভাবছে। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অধিকৃত ফিলিস্তীনী অঞ্চলে স্থাপিত বেআইনি বসতিতে উৎপাদিত পণ্য বর্জন, সেসব জায়গায় ব্যবসা করে যেসব কোম্পানি তাদের বিনিয়োগ প্রত্যাহারে বাধ্য করা এবং তাদের সঙ্গে সহযোগিতা নিষিদ্ধ করা। বিশ্বের বেশ কয়েকটি

বিশ্ববিদ্যালয় এই আন্দোলনের কারণে ইস্রাঈলী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতামূলক কার্যক্রমও বন্ধ রেখেছে।

ইস্রাঈল মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর নাগরিকদের আকৃষ্ট করতে দেশটি ভ্রমণের ক্ষেত্রে অনেক নিয়ম-নীতিই বদলে ফেলেছে। যেসব দেশ ইস্রাঈলে ভ্রমণ নিবৃত্ত করতে নানা রকম ব্যবস্থা নিয়ে রেখেছে, তাদের জন্য ইস্রাঈল আর পাসপোর্টে ভিসার স্ট্যাম্প লাগায় না এবং দেশটিতে ঢোকা ও বেরোনোর কোন সিল-ছাপ্পড়ও দেয় না। আলাদা কাগজে ভ্রমণ অনুমতি দিয়ে থাকে। ইস্রাঈলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই এমন দেশগুলোর হাযার হাযার মানুষ এই সুযোগ নিয়ে দেশটি ভ্রমণও করে থাকেন। কিন্তু তাতে করে পাসপোর্টে দেশটির সঙ্গে বৈধ সম্পর্ক না থাকার ঘোষণাটির রাজনৈতিক গুরুত্ব একটুও ক্ষুণ্ন হয় না। বরং আমরা সেই রাজনৈতিক গুরুত্বটা জেনেশুনে নষ্ট করছি অথবা অসচেতনভাবেই ইস্রাঈলের হাতে বর্জনমুক্ত হওয়ার তৃপ্তি লাভের সুযোগ করে দিয়েছি। ইস্রাঈলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আনুষ্ঠানিক টুইটে বাংলাদেশের পাসপোর্টের পরিবর্তনকে স্বাগত জানানোর ভিন্ন ব্যাখ্যা আর কী হ'তে পারে?

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের বক্তব্য থেকে আমরা জেনেছি যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁকে বলেছেন পাসপোর্টের এই পরিবর্তন ঘটেছে মাস ছয়েক আগে। যার মানে হচ্ছে, গত বছরের নভেম্বরের দিকে, যখন যুক্তরাষ্ট্রে চলছিল নির্বাচনী মৌসুম। সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেকোন ভাবে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব দাবী করতে তখন মরিয়া। সেপ্টেম্বরে তার মধ্যস্থতায় সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং বাহরায়েনের সঙ্গে ইস্রাঈলের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চুক্তি আব্রাহাম অ্যাকর্ড সই হয়েছে। আমিরাত ও বাহরায়েন প্রধানত সামরিক ও নিরাপত্তা প্রযুক্তির প্রয়োজনে সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। ইয়ামনে হাযার হাযার বেসামরিক মৃত্যুর জন্য অস্ত্র সরবরাহের পথে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিরোধিতার মধ্যেই আব্রাহাম চুক্তি সইয়ের পরপরই যুক্তরাষ্ট্র আমিরাতের জন্য শতকোটি ডলারের সমরসম্ভার বিক্রিতে সম্মত হয়। এরপর সুদান ও মরক্কো ট্রাম্প প্রশাসনের চাপে যথাক্রমে অক্টোবর ও ডিসেম্বরে আব্রাহাম চুক্তিতে যোগ দেয়। বিনিময়ে সুদান যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের তালিকা থেকে মুক্ত হয়। আর মরক্কোও আমিরাতের মতো শতকোটি ডলারের সমরাস্ত্র পেতে সক্ষম হয়। মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা অঞ্চলের অধিকাংশ দেশই এখনো এ ধরনের সমঝোতায় রাযী হয়নি। সঊদী আরব, কাতার, আলজেরিয়া ও ইরানের কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়।

ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানের পর বিশ্বের তৃতীয় শীর্ষ মুসলিমপ্রধান দেশের ভ্রমণ দলীল পাসপোর্টে ইস্রাঈলের বিষয়ে ঘোষিত নিষেধাজ্ঞা অপসারণের রাজনৈতিক মূল্যকে কোন ভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। আব্রাহাম চুক্তিতে অংশ নেওয়ার জন্য ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানের ওপর ট্রাম্প প্রশাসনের চাপের বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশের কথা আমরা জানি। বাংলাদেশের বেলায় যে এ রকম কিছু নেই, তা কি কেউ নিশ্চিত করতে পারেন? আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রায় অভিন্ন চেতনা জলাঞ্জলি দেওয়ার বিনিময়ে আমাদের প্রাপ্তি কী? এসব বিতর্ক এড়াতে পাসপোর্টে পুরোনো কথাগুলো ফিরিয়ে আনতে আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

॥ সংকলিত ॥

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্র: কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ **ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬**

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

পর্দা : বন্দীত্ব নয় স্বাধীনতা

*-নিশাত তাসনীম**

অম্লের (Acid) সঙ্গে ক্ষারের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে। একে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় Affinity (আসক্তি)। গবেষণায় জানা যায়, নারীর শরীর অম্লীয় বা এসিড ধর্মী। ফলে তারা অম্ল তথা টক খেতে বেশী পসন্দ করে। তাদের শরীরের কোমলত্ব, সৌন্দর্য ও লাবণ্যের মূল কারণ এই অম্লত্ব। পক্ষান্তরে পুরুষের শরীর ক্ষারীয়। ফলে তারা ক্ষার জাতীয় বস্তু তথা মিষ্টি বেশী খেতে পসন্দ করে। এসিডের সাথে ক্ষারের যেমন একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে, যা তীব্র এবং সূক্ষ্ম। তেমনি ক্ষারধর্মী শরীর ও অম্লধর্মী শরীরের মধ্যে একটা প্রাকৃতিক তীব্র আকর্ষণ রয়েছে।[১] নারী ও পুরুষের এই আকর্ষণ প্রকৃতিগত। তাইতো ইসলামী শরী'আত বেগানা নারী-পুরুষদের পরস্পরের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে পর্দার বিধান নাযিল করেছে। কিন্তু এই পর্দা আসলে কি?

আমরা অনেক সময় ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে, বিতর্কের মঞ্চে, রাস্তা-ঘাটে বিভিন্ন স্থানে কতক নারীকে দেখতে পাই যারা টি শার্টের সাথে জিন্স পরিহিতা। তবে তাদের অনেকের মাথায় থাকে বাঁধাকপি ডিজাইনের হিজাব প্যাঁচানো। আবার অনেক সময় দেখতে পাই আপাদমস্তক জিলবাবে আবৃত কিছু নারী, পর্দার কারণে বাইরে থেকে যাদের সঠিক বয়স ঠাওর করা যায় না। কারো কারো মতে, কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করলেই পর্দা করতে হয়। আবার কেউবা মনে করে পর্দা তো শুরুই হয় বিয়ের পর। তাই পর্দার ব্যাপারটা তারা গুরুত্বের সাথে দেখে না। সমাজের একশ্রেণীর মানুষকে আমরা দেখতে পাই, যারা পর্দা পালন করতে অন্য সবকিছু বিসর্জন দেয়। আবৃত করে নেয় নিজেকে চার দেয়ালের ভিতরে। অনেক সময় জ্ঞান অর্জন থেকেও তারা পিছিয়ে থাকে। একই সমাজে আরও এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। যারা পর্দাকে শুধু বুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। তাদের কাছে মনের পর্দাই বড় পর্দা। পোষাকের ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ কোন খেয়াল নেই। তাদের ধারণা ঐসব ঢিলা-ঢালা পোষাক তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। ক্যারিয়ার গঠনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাইতো বাহারি পোষাকে নিজেকে সজ্জিত করে, পর্দাকে তারা শুধুমাত্র মনের আসনেই বসিয়ে রেখেছে।

একই সমাজে বসবাসকারী মানুষের মাঝে পর্দার এতো রূপভেদ কেন? কেনইবা মানুষের চিন্তাধারার এতো অমিল? এ ব্যাপারে প্রথমেই যে দিকটি আলোকপাত করা যায়, তা হ'ল পশ্চিমা সংস্কৃতির কুপ্রভাব।

আমাদের সমাজের নারীদের মধ্যে পশ্চিমা সংস্কৃতির চর্চা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। তাদের তৈরী যে কোন স্টাইলিশ পোষাক এখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হ'ল, নারীদের পর্দার সবচেয়ে বড় হাতিয়ারকেও তারা ফ্যাশন বানিয়ে ছেড়েছে। পর্দার নামে বাযারে তাদের তৈরী বাহারি ডিজাইনের বোরক্বা পাওয়া যায়। যাতে নারীদের শরীরের আকৃতি খুব সহজেই অন্যের দৃষ্টিগোচর হয়। ফলে পর্দার আসল উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয়। চিপাচাপা বোরক্বাগুলোকে ঢাল বানিয়ে প্রাথমিক অবস্থায় তারা সাধারণ মানুষের ঈমান হরণের প্রথম অস্ত্র বানিয়েছে। এভাবে সাধারণ মুসলিমরা খুব সহজেই তাদের ফাঁদে পা রাখছে। তাদের অনুসরণে হিজাবে আবৃত কিছু কিছু নারী কড়া বডি স্প্রে মেখে রাস্তায় বেরুচ্ছে।

পশ্চিমারা মঞ্চ থেকে মিডিয়া সর্বক্ষেত্রেই নারীদের পদচারণা বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা নারী স্বাধীনতার নামে নারীদের পণ্য বানাচ্ছে। বিভিন্ন কসমেটিকস-এর গায়ে নারীদের অশালীন ছবি থেকে সংবাদ পাঠের সেই অর্ধ নগ্ন নারী ঘোষিকার দিকে তাকিয়ে অভ্যস্ত আমরাও ভুলে গেছি পর্দার আসল রূপ। কর্পোরেট দুনিয়ায় সেই প্রতিষ্ঠিত নারীদের দিকে তাকালে সাধারণ নারীদের মনে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, আসলেই পর্দা ক্যারিয়ার গঠনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে না তো? নারীদের বন্দী করে রাখছে না তো?

বিভিন্ন নারীবাদী বইগুলো পর্দার বিরুদ্ধে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। তারা যেভাবে নারী স্বাধীনতার কথা বলে, তাতে সাধারণ মুসলিমরা খুব সহজেই তাদের ফাঁদে পা দেয়। তারা নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার ধোয়া তুলে নারীদের ভোগের পণ্য বানাচ্ছে। অথচ আমাদের মতো নারীরাই এই স্বাধীনতার পক্ষ নিয়ে লড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, আমরা আমাদের জীবন বিধান পবিত্র কুরআনকে নিজের থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছি। ফলে পর্দা সম্পর্কে ভুল ধারণা আমাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে।

জানা যায়, সম্প্রতি সঊদী আরবের বাদশাহ প্রিন্স সালমান নারী স্বাধীনতায় কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। নারীদের গাড়ি চালানো, তাদের স্টেডিয়ামে গিয়ে খেলা দেখা এমনকি মেয়েদের সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ারও অনুমতি দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে নারী স্বাধীনতার নামে এই কাজগুলো অত্যন্ত গর্হিত। এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে নারীদের অনাবৃত করে বরং পণ্য বানানো হচ্ছে। যা অধিকাংশ নারীই বোধগম্য নয়।

উল্লেখ্য, পর্দাই নারীর সম্মান এবং পর্দা বিধানের মধ্যেই রয়েছে নারীর প্রকৃত স্বাধীনতা। এক্ষণে পর্দা সংক্রান্ত এই ভুলগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে আমাদেরকে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

(১) সঠিক ইসলামী চেতনা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে পর্দার বিধান নারীদের বন্দী করার জন্য নাযিল হয়নি। বরং নারীদের ভোগের পণ্য থেকে বাঁচাতে পর্দা ফরয করা হয়েছে। পর্দা এসেছে নারীদের আসল মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে। পর্দাই পশ্চিমা দেশগুলোর ভয়াল থাবা থেকে নারীদের রক্ষা করতে পারে। অথচ শর্টকাট পোষাক বা ছোট পোষাক, যাতে শরীরের বেশীর ভাগই অনাবৃত থাকে, তা পরিধান করা পশ্চিমাদের কালচারে পরিণত হয়েছে। তাদের কাছে পেট, পিঠ, উরু খোলা রাখা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। বিজ্ঞাপনগুলো অশালীন সেই নারীদের ছাড়া অচল। ফলে সেখানে প্রতিনিয়ত ঘটছে ইভটিজিং ও ধর্ষণের মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনা।

** বি.এ (অনার্স), ৩য় বর্ষ, রসায়ন বিভাগ, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।*

১. *মোঃ সফিকুল ইসলাম ভূঞা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পর্দা, (ঢাকা : রাহবার পাবলিকেশন্স) পৃঃ ১১।*

www.at-tahreek.com

অথচ ইসলামের নির্দেশনা হচ্ছে নারীদের আপদমস্তক আবৃত রাখা। আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে বলেন, ‘হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(আহযাব ৩৩/৫৯)*।

এছাড়াও আব্রুর পাশাপাশি পর্দা আমাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত ও দৃষ্টিকে নত রাখতে নির্দেশ দেয়। আল্লাহ বলেন, ‘তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতর’ *(নূর ২৪/৩০)*। তিনি আরো বলেন, ‘আর তুমি মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে’ *(নূর ২৪/৩১)*।

এখানে আল্লাহ তা‘আলা মুমিন নারী-পুরুষ সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, দৃষ্টি এবং যৌণাঙ্গের হেফাযতের মাধ্যমে পর্দা রক্ষা সম্ভব। শুধু নারীদের জন্য নয়, পুরুষদের জন্যও বেঁধে দেন কিছু সীমারেখা। কিন্তু পর্দার বিধান লঙ্ঘন করার কারণে আজ রাষ্ট্র ও সমাজে এর ক্ষতিকর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টিগোচর হয় ন্যাক্কারজনক ও লোমহর্ষক বহু ঘটনা। মাঝে মাঝে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, রাস্তার ধারে, কখনোবা স্টেশনের গলিতে, ডাস্টবিনে ব্যাগে ভর্তি পাওয়া যায় ফুটফুটে নবজাতকের বেওয়ারিশ লাশ। অবৈধ গর্ভের ফসল নিষ্পাপ সন্তানকে প্রসবের সাথে সাথেই ছুঁড়ে ফেলা হয় ডাস্টবিনে। এসবই পর্দা বিধান লঙ্ঘন এবং যৌনাঙ্গের হেফাযত না করার বিষময় ফল।

(২) এ কথা বুঝতে হবে এবং বুঝাতে হবে যে, পর্দা নারীদের ক্যারিয়ার গঠনে কখনও বাধা সৃষ্টি করে না। অতীত ইতিহাস থেকে আমরা জানি, ইসলামের স্বর্ণযুগে পর্দা করেও নারীরা জ্ঞান অর্জনে অনেক এগিয়ে ছিলেন। একবার কয়েকজন নারী এসে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে আবেদন করেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! (জ্ঞানার্জনের জন্য) পুরুষরা আপনার নিকট আমাদের চেয়ে বেশী প্রাধান্য পায়। আপনি আমাদের (জ্ঞানার্জনের) জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে দিন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নারীদের জন্য একটি বিশেষ দিন নির্ধারণ করে দেন। যেদিন তিনি তাঁদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে নছীহত করতেন ও নির্দেশনা দিতেন *(বুখারী হা/১০১)*।

শুধু পর্দার ভুল ব্যাখ্যার কারণেই অনেকে পর্দাকে বন্দীত্ব মনে করে। অনেকেই তার যৌবনে পদার্পণ করা মেয়েটিকেও পর্দা করতে নিরুৎসাহিত করে। মনে রাখা উচিত, প্রয়োজনের তাকীদে পর্দা করেই নারীরা ঘরের বাইরে বেরুবে। কোন অবস্থাতেই পুরুষদের লালসার খোরাক হয়ে বাইরে বেরুবে না। নারীদের যেমন কোমল এবং দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেকারণ তাদের জন্য নিজ গৃহই হচ্ছে উত্তম ও নিরাপদ আবাসস্থল। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘আর তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করবে। প্রাচীন জাহেলী যুগের নারীদের ন্যায় সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়াবে না’ *(আহযাব ৩৩/৩৩)*।

অপরদিকে পুরুষদের সৃষ্টি করা হয়েছে নারীদের তুলনায় শক্তিশালী করে। এজন্য উপার্জন ও সংসার পরিচালনার সব দায়িত্ব তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তাই বলে ইসলাম নারীকে বন্দী করে রাখে না। প্রয়োজনে নারীরা নিজেকে পর্দায় আবৃত করে নিরাপদ ও পৃথক পরিবেশে চাকুরী করতে পারে। তবে নারীদের জন্য নির্দিষ্ট সীমারেখার ভিতরে কিছু পুরুষ ব্যতীত সকলের সাথে পর্দা মেনে চলতে হবে। আল্লাহ বলেন, ‘তারা যেন তাদের মাথার কাপড় বক্ষদেশে টেনে দেয়। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজ পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনীপুত্র, নিজেদের বিশ্বস্ত নারী, অধিকারভুক্ত দাসী, কামনামুক্ত পুরুষ এবং শিশু, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অবহিত নয় তারা ব্যতীত। আর তারা যেন এমন ভাবে চলাফেরা না করে যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। আর হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাও, যাতে তোমরা সফলকাম হ’তে পার’ *(নূর ২৪/৩১)*। উপরোক্ত ব্যক্তিগণ ছাড়া বাকী সবার সাথেই নারীরা নিজেকে আবৃত রাখবে।

(৩) পশ্চিমা সংস্কৃতি পরিহারে আমাদের জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আমাদের উচিৎ পশ্চিমাদের তৈরী নগ্ন পোষাক গুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয়া। তাদের বিভিন্ন উৎসব-আয়োজন থেকে নিজেদের দূরে রাখা। ভ্যালেন্টাইন্স ডে, থার্টি ফার্স্ট নাইট জাতীয় বেলেল্লাপূর্ণ উৎসবগুলোকে বর্জন করা।

পরিশেষে বলব, পর্দা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের জন্য এক অনন্য সম্মান। যা মূলত ইসলামী শরী‘আতের যথার্থতা, পূর্ণতা ও সর্বকালের জন্য অমোঘ বিধান হওয়ার এক প্রচ্ছন্ন দলীল। পর্দা নারী মর্যাদার প্রতীক। এটি নারীর সম্মান, স্বাধীনতা ও সমাজের পবিত্রতার রক্ষাকবচ। এতে রয়েছে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য। পর্দা চরিত্রের পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার মাধ্যম। পর্দা নারীর নারীত্ব, সম্ভ্রম ও মর্যাদার গ্যারান্টি। এটা লজ্জাশীলতা ও সচ্চরিত্রের পরিচায়ক। মানবরূপী শয়তানের দৃষ্টি থেকে রক্ষার অনন্য উপায়। এটা অবৈধ প্রণয়, ধর্ষণ, অশ্লীলতা ও ব্যভিচার দূর করে, নারীর মান ও মূল্য রক্ষা করে। জিনিস যত দামী ও মূল্যবান হয়, তাকে তত গোপনে লুকিয়ে রাখা হয়। যত্রতত্র কাঁচ পাওয়া যায় বলেই তার কোন কদর নেই। কিন্তু কাঞ্চন সর্বত্র পাওয়া যায় না বলেই তার এত কদর। পর্দানশীনা ও সৎকর্মশীলা নারী কাঁচ নয়; বরং সুরক্ষিত মণি-কাঞ্চন স্বরূপ।

পর্দা প্রগতির পথ অবরোধ করতে চায় না; চায় বেলেল্লাপনা ও নগ্নতার পথ রুদ্ধ করতে। পক্ষান্তরে পর্দাহীনতা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা। এটা নগ্নতা, অসভ্যতা, অশ্লীলতা, লজ্জাহীনতা ও ধৃষ্টতা। এটা সাংসারিক অশান্তি, ধর্ষণ, অপহরণ, ব্যভিচার প্রভৃতির ছিদ্রপথ। পর্দাহীনতা কেবল ধর্মীয় শৃঙ্খল থেকে নারীমুক্তি বা নারীস্বাধীনতা নয়, বরং শালীন পোষাক-পরিচ্ছদের আবরণ থেকে নারীর সৌন্দর্য প্রকাশ ও দেহ উন্মুক্ত করণের নামান্তর। পর্দাহীনতা বিজাতীয় ইবলীসী ও জাহেলী প্রথা। বর্তমান যুগের এই নগ্নতা দেখে জাহেলী যুগের পর্দাহীনারাও হয়তো লজ্জা পাবে। অতএব মুসলিম নারীদের এখনই সাবধান হওয়া উচিত। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন-আমীন!

খুৎবাতুল হাজাতের গুরুত্ব ও ব্যক্তির উপরে তার প্রভাব

রাসূল (ছাঃ)-এর কথা বিভিন্ন মানুষের উপরে প্রভাব বিস্তার করতো। ফলে তারা ইসলাম কবুল করে জীবন পরিচালনা করতেন রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী। বিগত জীবনের যাবতীয় রসম-রেওয়াজ থেকে সর্বতোভাবে ফিরে আসতেন। ফেলে আসা জীবনের ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করতেন। তেমনি সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন যিমাদ ইবনু ছা'বালা আল-আযদী (রাঃ)। খুৎবাতুল হাজাত তার ভিতরে কি প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে সম্পর্কেই নিম্নোক্ত হাদীছ।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যিমাদ (রাঃ) মক্কায় আগমন করলেন। তিনি ছিলেন আযদ শানুয়া গোত্রের লোক। তিনি বাতাস লাগার ঝাঁড় ফুঁক করতেন। তিনি মক্কার কতিপয় নির্বোধ লোককে বলাবলি করতে শুনলেন যে, মুহাম্মাদ উন্মাদ। যিমাদ বললেন, আমি যদি এ লোকটিকে দেখতাম, হয়ত আমার হাতে আল্লাহ তাঁকে শিফা দিতেন। রাবী বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমি ঐসব ব্যাধির ঝাঁড়-ফুঁক করে থাকি। আর আল্লাহ আমার হাতে যাকে ইচ্ছা শিফা (আরোগ্য) দান করেন। আপনি কি ঝাঁড়-ফুঁক করাতে ইচ্ছুক?

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সকল হাম্‌দ ও প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য। আমি তাঁরই হাম্‌দ বর্ণনা করছি, তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হেদায়াত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

রাবী বলেন, যিমাদ বললেন, আপনার বাক্যগুলো পুনরাবৃত্তি করুন। রাসূল (ছাঃ) তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। রাবী বলেন, যিমাদ বললেন, অনেক গণক, যাদুকর ও কবিদের কথাবার্তা শুনেছি, কিন্তু আপনার এ বাক্যগুলোর মত আর শুনিনি। আপনার এ বাক্যগুলো সাগরের গভীরতায় পৌঁছে গিয়েছে।

রাবী বলেন, যিমাদ বললেন, হাত বাড়িয়ে দিন আমি আপনার কাছে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করব। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বায়'আত করে নিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এ বায়'আত কি তোমার কওমের পক্ষ হ'তেও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার কওমের পক্ষ হ'তেও। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি ছোট সেনাদল প্রেরণ করলেন। তারা যিমাদ (রাঃ)-এর গোত্রের নিকট দিয়ে অতিক্রম করল। সেনাপ্রধাণ তার সৈন্যদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি যিমাদের কওমের নিকট থেকে কোন জিনিস গ্রহণ করেছ? তখন তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল, আমি একটি পানির (ওযূর) পাত্র নিয়েছি। সেনানায়ক বললেন, তা ফিরিয়ে দাও। এ মানুষগুলো হ'ল যিমাদ (রাঃ)-এর গোত্রের লোক' *(মুসলিম হা/৮৬৮)*।

শিক্ষা :

১. আরবের লোকেরা ইসলামপূর্ব যুগে জিনের আছরের প্রতি বিশ্বাসী ছিল। যাকে তারা বাতাসের মন্দ প্রভাব বলত। ইসলাম এসে তাকে স্বীকৃতি দেয় *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*।

২. আরবের লোকেরা জিনের আছর থেকে ঝাঁড়-ফুঁক করতো। কখনো তারা জিনের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতো। ইসলাম এসে তা বাতিল করে দেয় *(জিন ৭২/৬)*। এখনও কোন মুসলমান রোগমুক্তি ও যাদু থেকে মুক্তির জন্য জিনের কাছে আশ্রয় চায়। যেটা বড় শিরক। যা মানুষের সকল আমল বাতিল করে দেয়।

৩. জাহেলী যুগেও কিছু মানুষ ছিল যারা বিশ্বাস করতো যে, রোগ থেকে আরোগ্য দানকারী কেবল আল্লাহ। কিন্তু বর্তমানে কিছু কিছু মুসলমান আছে, যারা বিশ্বাস করে যে, রাসূল (ছাঃ) ও পীর-আওলিয়ারা বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি দিতে পারেন *(নাঊযুবিল্লাহ)*। অথচ আল্লাহ ব্যতীত কেউ রোগমুক্তির ক্ষমতা রাখে না *(শু'আরা ২৬/৮০; বুখারী হা/৫৭৪২)*।

৪. যিমাদ (রাঃ) খুৎবাতুল হাজাত শ্রবণ করে রাসূল (ছাঃ)-কে তা পুনরাবৃত্তি করতে বলেন। তিনি শ্রবণ করে স্বীয় কওম সহ ইসলাম কবুল করেন।

৫. খুৎবাতুল হাজাত রাসূল (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে শিক্ষা দিতেন। এটা বিবাহের সময়, জুম'আয় ও অন্যান্য বক্তব্যের সময় পাঠ করা হয়।

৬. এক মুসলমানের নিকট অপর মুসলমানের জান-মাল নিরাপদে থাকবে।

-মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

শিক্ষিকা আবশ্যক

দারুস সুন্নাহ মহিলা ক্যাডেট মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা

উত্তর কেল্লাবন্দ (বানিয়া পাড়া), সি.ও বাজার, রংপুর।

ক্রমি. নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১	হাফেযা	২	কুরআনের হাফেযা। ইয়াদ ও লাহান ভালো থাকতে হবে। অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
২	সহকারী শিক্ষিকা (ইসলাম শিক্ষা)	২	ফাযিল/কামিল/দাওরায়ে হাদীছ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
৩	ক্বারী/মু'আল্লিমা	২	দাখিল/আলিম। ক্বারিয়ানা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন।
৪	সহকারী শিক্ষিকা (সাধারণ)	২	ফাযিল/কামিল/বি.এ/এম.এ। অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে অতিসত্বর নিম্নলিখিত মেইলে জীবন বৃত্তান্ত প্রেরণের জন্য বলা হ'ল। বেতন-ভাতা আলোচনা সাপেক্ষে। আবাসিক শিক্ষিকাদের ফ্রী থাকা ও খাওয়া ব্যবস্থা আছে।

যোগাযোগ : প্রতিষ্ঠান পরিচালক- ০১৭১২-৫৯৩৬৮৩; e-mail : moshiur308057@gmail.com

অমর বাণী

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

১. মালেক ইবনু দীনার (রহঃ) বলেন, بِقَدْرِ مَا تَحْزَنُ لِلدُّنْيَا كَذَلِكَ يَخْرُجُ هَمُّ الْآخِرَةِ مِنْ قَلْبِكَ، وَبِقَدْرِ مَا تَحْزَنُ لِلْآخِرَةِ كَذَلِكَ يَخْرُجُ هَمُّ الدُّنْيَا مِنْ قَلْبِكَ 'তুমি দুনিয়া নিয়ে যতটুকু পেরেশান হবে, তোমার হৃদয় থেকে ততটুকু আখেরাতের চিন্তা উধাও হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে আখেরাতের ব্যাপারে তুমি যতটুকু চিন্তা-ভাবনা করবে, সেই পরিমাণ পার্থিব দুশ্চিন্তা তোমার হৃদয় থেকে বের হয়ে যাবে'।[১]

২. মুহাম্মাদ বিন সূক্বাহ (রহঃ) বলেন, أَمْرَانِ لَوْ لَمْ نُعَذَّبْ إِلَّا بِهِمَا لَكُنَّا مُسْتَحِقِّينَ بِهِمَا الْعَذَابَ: أَحَدُنَا يَزْدَادُ فِي دُنْيَاهُ فَيَفْرَحُ فَرَحًا مَا عَلِمَ اللهُ مِنْهُ قَطُّ أَنَّهُ فَرِحَ بِشَيْءٍ قَطُّ زِيدَ فِي دِينِهِ مِثْلَهُ، وَأَحَدُنَا يُنْقَصُ مِنْ دُنْيَاهُ فَيَحْزَنُ حُزْنًا مَا عَلِمَ اللهُ مِنْهُ قَطُّ أَنَّهُ حَزِنَ عَلَى شَيْءٍ نُقِصَهُ مِنْ دِينِهِ مِثْلَهُ، 'যদি আমাদেরকে দু'টি কারণে শাস্তি দেওয়া হ'ত, তাহ'লে আমরা সেই দু'টি কারণেই শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত হয়ে যেতাম। (১) আমাদের কেউ কেউ দুনিয়ার ধন-সম্পদ বৃদ্ধিতে আনন্দিত হয়, অথচ আল্লাহ কখনো তাকে দ্বীনের পাথেয় বৃদ্ধিতে এতটা খুশি দেখেননি। (২) আমাদের কেউ কেউ দুনিয়াবী ক্ষতির সম্মুখীন হ'লে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়, অথচ দ্বীনের কোন ঘাটতিতে আল্লাহ কখনো তাকে ততটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখেন না'।[২]

৩. হযরত আবূবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) যখন ওমর (রাঃ)-কে খলীফা নিযুক্ত করেন, তখন তাকে অছিয়ত করে বলেন, إِنَّ أَوَّلَ مَا أُحَذِّرُكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ، 'সর্বপ্রথম আমি আপনাকে আপনার নফসের ব্যাপারে সতর্ক করছি, যে নফসের অবস্থান আপনার মাঝেই'।[৩]

৪. মুহাম্মাদ বিন ওয়াসে' (রহঃ) বলেন, حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم، 'দীনার-দিরহাম সংরক্ষণের চেয়ে জিহ্বার হেফাযত করা অত্যন্ত কঠিন'।[৪]

৫. সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না (রহঃ) বলেন, أَشَدُّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَفْضَلَ عَمَلًا مِنْهُ، وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يَتَصَدَّقْ مِنْهُ فَمَاتَ فَوَرِثَهُ غَيْرُهُ فَتَصَدَّقَ مِنْهُ , وَرَجُلٌ عَالِمٌ لَمْ يَنْتَفِعْ بِعِلْمِهِ فَعَلَّمَهُ غَيْرَهُ فَانْتَفَعَ بِهِ، 'ক্বিয়ামতের দিন তিন প্রকার মানুষ সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে- (১) এমন ব্যক্তি, যার একজন ক্রীতদাস ছিল, যে ক্বিয়ামতের দিন তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে উপস্থিত হবে, (২) এমন ব্যক্তি, যার সম্পদ ছিল, কিন্তু সে তার জীবদ্দশায় তা থেকে দান-ছাদাক্বাহ করতে পারেনি, তবে সে মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীরা তা থেকে দান করেছে এবং (৩) এমন ব্যক্তি, যে নিজে আলেম ছিল, কিন্তু সে তার ইলম দ্বারা উপকৃত হ'তে পারেনি, তবে সে অন্যদের শিক্ষা দিয়েছিল এবং তারা সেই ইলম দ্বারা উপকৃত হয়েছে'।[৫]

৬. হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه، الوَرِع الكافُّ عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم، الناصح لهم، 'সত্যিকারের জ্ঞানী ব্যক্তি তো সে-ই, যে পার্থিব জীবনের প্রতি অনাগ্রহী, আখেরাতের জীবনের জন্য উন্মুখ, দ্বীন সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখে, নিয়মিত তার রবের ইবাদত করে, মুসলিমদের সম্মান লঙ্ঘন করা থেকে বিরত থাকে, তাদের সম্পদ কুক্ষিগত করা থেকে নিবৃত্ত থাকে এবং তাদেরকে দ্বীনের সদুপদেশ দেয়'।[৬]

৭. আবূ সুলাইমান (রহঃ) বলেন, أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، 'বিনোদন প্রেমী লোকের আমোদ-প্রমোদে ডুবে থাকার চেয়ে ইবাদতগুযার বান্দার জন্য রাতের ইবাদতে মগ্ন থাকা অধিকতর উপভোগ্য। যদি রাত না থাকত, তাহ'লে দুনিয়াতে বেঁচে থাকার ব্যাপারে আমার কোন ইচ্ছাই থাকত না'।[৭]

৮. ওয়াহ্হাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন, مَثَلُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَثَلُ ضَرَّتَيْنِ، إِنْ أَرْضَيْتَ إِحْدَاهُمَا أَسْخَطْتَ الْأُخْرَى، 'দুনিয়া ও আখেরাতের তুলনা হ'ল দুই সতীনের মতো। তুমি যদি তাদের একজনকে সন্তুষ্ট রাখ, তাহ'লে অপরজনকে অবশ্যই অসন্তুষ্ট করতে হবে'।[৮]

৯. সুফিয়ান আছ-ছাওরী (রহঃ) বলেন, لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا مَنْ كَانَ فِيهِ خِصَالٌ ثَلَاثٌ: رَفِيقٌ بِمَا يَأْمُرُ، رَفِيقٌ بِمَا يَنْهَى، عَدْلٌ بِمَا يَأْمُرُ، عَدْلٌ بِمَا يَنْهَى، عَالِمٌ بِمَا يَأْمُرُ، عَالِمٌ بِمَا يَنْهَى، 'সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ কেবল সেই ব্যক্তিই কারতে পারে, যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। (১) আদেশ-নিষেধের বিষয়ে কোমলতা, (২) আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা এবং (৩) যে বিষয়ে আদেশ-নিষেধ করবে, সেই বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান থাকা'।[৯]

---

১. *আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহদ, পৃ. ২৫৯।*
২. *আবূ নু'আইম ইছফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ৫/৪।*
৩. *ইবনু রজব হাম্বলী, জামে'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম, ১/৪৯০।*
৪. *গাযালী, এহইয়াউ উলূমিদ্দীন, ৩/১১১।*
৫. *আবূ নু'আইম ইছফাহানী, হিলয়াতুল আউলিয়া ৭/২৮৮।*
৬. *ইবনু কুদামাহ মাক্বদেসী, মুখতাছার মিনহাজুল ক্বাছেদীন, পৃ. ২১।*
৭. *আবূ ত্বালেব মাক্কী, কূতুল কুলূব ফী মু'আমালাতিল মাহবূব ১/৭১।*
৮. *হিলয়াতুল আউলিয়া, ৪/৫১।*
৯. *জামে'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম ২/২৫৬।*

করোনা থেকে সেরে ওঠার পরও যেসব শারীরিক ও মানসিক জটিলতা থেকে যায়

করোনাভাইরাস থেকে সেরে ওঠার পরও শারীরিক ও মানসিক নানা সমস্যা থেকে যায়। বিশেষত চরম শারীরিক দুর্বলতা। দু'-এক সপ্তাহ পর্যন্ত এ রকম দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক। যেকোন অসুস্থতায়, বিশেষ করে ভাইরাসজনিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর এটা হয়ে থাকে। কিন্তু করোনা থেকে সেরে ওঠার পর অনেকেই মাস, এমনকি বছরব্যাপী ক্লান্তি আর দুর্বলতায় ভোগেন।

কারণ : করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ওই ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকে। এই প্রতিরোধ ক্ষমতা এক পর্যায়ে অনিয়ন্ত্রিতভাবে সক্রিয় হয়ে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রদাহের সৃষ্টি করে। যার ফলে নানা শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়।

সাধারণত শারীরিক দুর্বলতা ও অল্পতেই হাঁপিয়ে ওঠার মতো সমস্যাগুলো থেকে যায়। শরীর ম্যাজ ম্যাজ করা, অস্থিসন্ধি ও মাংসপেশিতে ব্যথা, অবসাদ এবং ক্লান্তি ভাব হয়। কারও গা, হাত-পা জ্বালাপোড়া ও ঝিনঝিন করে। বিষণ্ণতা আর অবসাদগ্রস্ততা চেপে বসে। কারও পেটে অস্বস্তির অনুভব হয়। সামান্য শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমেই বেড়ে যায় নানা উপসর্গ। কেন এমনটা ঘটে, তার সুনির্দিষ্ট উত্তর এখনো চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের জানা নেই। এছাড়া রোগীর স্বাস্থ্য পরিস্থিতি, লিঙ্গ ও বয়স ভেদে একেকজনের লক্ষণ একেক মাত্রার হ'তে পারে।

ফুসফুস : করোনাভাইরাস সবচেয়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে ফুসফুসে। অনেকে করোনাভাইরাস নেগেটিভ হওয়ার পরও তার কাশি, শ্বাসকষ্ট দীর্ঘদিন ধরে থেকে যেতে পারে। ফুসফুসের এই দুর্বলতার কারণে দেখা যায় রোগীরা অল্পতেই খুব হাঁপিয়ে ওঠেন। ভীষণ দুর্বলতা ও ক্লান্তিবোধ কাজ করে।

আবার যেসব রোগীদের আইসিইউ বা যরূরী অক্সিজেন নিতে হয়েছে তাদের অনেকের ফুসফুসে পালমোনারি ফাইব্রোসিস সমস্যা দেখা দিতে পারে। যার ফলে রোগীর স্বাভাবিকভাবে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে ভীষণ কষ্ট হয়। বুকে চাপ দিয়ে ব্যথা করে। ভারী ভারী লাগে।

হৃদপিণ্ড : কোভিড-১৯ ফুসফুসের রোগ বলা হ'লেও এটি হৃদপিণ্ডের ওপরও বিরূপ প্রভাব ফেলে থাকে। সাম্প্রতিক এক গবেষণার অংশ নেয়া কোভিড রোগীদের ৭৮% পরবর্তীতে হৃদপিণ্ডের নানা জটিলতায় আক্রান্ত হয়েছেন।

লিভার : ভাইরাসজনিত রোগে আক্রান্ত হ'লে লিভার স্বাভাবিক সময়ের চাইতে বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর পরিস্থিতি যদি জটিল পর্যায়ে পৌঁছে যায় তাহ'লে পরবর্তীতে তাদের জন্ডিস, লিভার ফেইলিওর হওয়ার আশঙ্কা থাকতে পারে।

মানসিক সমস্যা : করোনাভাইরাস থেকে সুস্থ হওয়ার পরও অনেক রোগী দেখা গেছে দীর্ঘদিন ধরে মানসিক উদ্বেগ, বিষণ্ণতায় ভুগেন। অনেকেই কাজে মনোযোগ দিতে পারছেন না। ছোটখাটো বিষয় ভুলে যাচ্ছেন, ধৈর্য হারিয়ে ফেলছেন। এদিকে অনেকের কোভিডের পর অস্বাভাবিক হারে চুল পড়তে থাকে। এছাড়া চোখের প্রেশার বা চোখের নানা প্রদাহজনিত সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগও এসেছে।

কোভিড-১৯ থেকে সেরে ওঠার পরেও অনেকের ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়, ওজন খুব দ্রুত কমে যায়। ফলে প্রেশার লো হয়ে আসে। আবার যারা হাইপার টেনশনে ভোগেন তাদেরও প্রেশার হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। যারা ডায়াবেটিসে ভুগছেন তাদের রক্তে চিনির পরিমাণ খুব দ্রুত ওঠা নামা করে।

যেসব রোগীদের অক্সিজেনের মাত্রা ৯০ এর নীচে নেমে যায় তাদেরকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করে অক্সিজেন দিতে হয়। পরিস্থিতি জটিল হলে চিকিৎসকরা রোগীকে স্টেরয়েড দিয়ে থাকেন। স্টেরয়েড তাৎক্ষণিক জীবন বাঁচাতে ভূমিকা রাখলেও এর ফলে ডায়াবেটিস ও প্রেশার অনিয়ন্ত্রিত হ'তে পারে।

করণীয় :

■ **পূর্ণাঙ্গ বিশ্রাম :** করোনা থেকে সেরে ওঠার সময় শারীরিক-মানসিক বিশ্রাম খুবই যরূরী। নেগেটিভ হওয়ামাত্র কাজে যোগ দেওয়া যাবে না। টিভি, ফোন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকুন। দেহ-মনকে শান্ত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন, বেশি বেশি ছালাত আদায় করুন, কুরআন তেলাওয়াত করুন বা শুনুন, বই পড়ুন।

■ **পর্যাপ্ত ঘুম :** পর্যাপ্ত ঘুম খুব যরূরী। শোয়ার ঘর অন্ধকার ও আরামদায়ক হ'তে হবে। রুটিন করে সঠিক সময়ে ঘুমাতে হবে।

■ **পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার ও পানীয় :** পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। খাদ্যতালিকায় আমিষ, শর্করার পাশাপাশি টাটকা ফলমূল ও শাকসবজি রাখুন। প্রতিদিন ২-৩ লিটার পানি এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ ফলের রস পান করুন।

■ **নিজেকে সচল রাখা :** নিজেকে আস্তে আস্তে সচল রাখতে সচেষ্ট হোন। বিছানা থেকে উঠে নড়াচড়ার চেষ্টা করুন। শুয়ে শুয়ে পায়ের ব্যায়াম করুন। দুর্বল বোধ করলে ১০ মিনিট দিয়েই শুরু করেন, হালকা শরীর চর্চা করুন, হাঁটুন। এরপর ১৫ মিনিট তারপর আধা ঘণ্টা সময় বাড়িয়ে দিন।

■ **শ্বাসতন্ত্রের ব্যায়াম :** নিয়ম করে রেসপিরেটরি এক্সারসাইজ করুন। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ফুসফুসের ব্যায়ামগুলো শিখে নিন।

■ **মনকে উদ্দীপ্ত রাখা :** মনকে সতেজ ও উদ্দীপ্ত রাখার চেষ্টা করুন। পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান। সরাসরি সম্ভব না হ'লে অনলাইনে যোগাযোগ করুন।

■ **রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি :** এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে ভিটামিন ডি। যার উৎস হল সূর্য। বিশেষত সকাল ৯টা থেকে ১১টা এই সময়ে শরীরের চামড়ায় সরাসরি রোদ লাগানোর চেষ্টা করুন!

॥সংকলিত॥

বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরে দুগ্ধখামারি

প্রায় দেড় দশক আগের কথা। বগুড়ার তরুণ তাওহীদ পারভেয পড়াশোনা করতে যান নিউজিল্যান্ডের রাজধানী অকল্যান্ডে। পড়ার বিষয় ছিল আন্তর্জাতিক ব্যবসা। পড়ার ফাঁকে তার শখ ছিল বিভিন্ন দুগ্ধ খামারে ঘুরে বেড়ানো। বিশাল বিশাল বিদেশী গাভী দেখে বিস্মিত হ'তেন। এগুলো কিভাবে লালন-পালন করা হয়, খামারীদের কাছ থেকে সে গল্প শুনতেন।

দুগ্ধ খামার করার ঝোঁকটা তখন থেকেই। দেশে ফিরে ২০১১ সালে সাতটি এঁড়ে বাছুর কিনে নিজেই একটি গরুর খামার দিয়ে বসেন। শুরুতে পরিবারের লোকজন বিষয়টাকে ভালোভাবে নেননি। কিন্তু নিজের স্বপ্নে অটল পারভেয। সহপাঠীরা যখন ভালো চাকরির স্বপ্ন দেখেন, তিনি তখন চাকরি দেওয়ার, একজন উদ্যোক্তা হওয়ার কথা ভাবতেন।

সেই ভাবনা থেকেই গড়ে তুলেছেন বগুড়া ভাণ্ডার ডেইরী অ্যান্ড অ্যাগ্রো ফার্ম লিমিটেড। প্রায় ১২ বিঘা জায়গাজুড়ে বিশাল খামার। এর বাইরে ৩৫ বিঘা জমিতে ধান ও বিদেশী জাতের ঘাস চাষ করছেন। খামারে আছে ৮০টি বিদেশী উন্নত জাতের গাভী। এগুলোর মধ্যে ২০টি গাভী থেকে এখন প্রতিদিন ২০০ লিটার দুধ উৎপাদিত হচ্ছে। খামারে আছে আরও ৬০টি গর্ভবতী গাভী। এছাড়া আছে আরো শতাধিক বিদেশী জাতের এঁড়ে গরু।

দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের জন্য গরুর খামার দিয়ে তাওহীদ পারভেয এখন সফল উদ্যোক্তা। তাঁর খামার ও খামারসংলগ্ন পাটকল, আটার কল, হিমাগার ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় দেড় হাযার শ্রমিকের। করোনা মহামারির সময় গোটা দেশে কাজের জন্য যখন হাহাকার, অনেকে চাকরী হারাচ্ছে, পুঁজি খোয়াচ্ছেন তখন তার খামারে দিব্যি কাজ করছে হাযারো মানুষ।

৩৬ বছর বয়সী তাওহীদ থাকেন পিতা-মাতার সাথে। গরুর খামারের পাশাপাশি পৈত্রিক ব্যবসা পাটকল ও আটার কল দেখভাল করেন। তিনি বলেন, 'উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন নিয়েই ব্যবসাবিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনের জন্য নিউজিল্যান্ডে যাই। সেখানে অকল্যান্ড ইনস্টিটিউট অব স্টাডিজে পড়াশোনা করি।

দেশে ফিরে প্রথমে পুকুরে মাছ চাষ এবং ফলদ বাগান করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ২০১০ সালে কুরবানী ঈদে পিতার সঙ্গে হাটে গিয়ে একটা নাদুসনুদুস গরু কিনলাম। রান্নার পর মুখে দিয়ে বোকা বনে গেলাম। খালি চর্বি, স্বাদ নেই। বুঝলাম, বেশি লাভের আশায় অল্প সময়ে অসৎ উপায়ে মোটাতাজা করা হয় গরুটিকে। তারপরই খামার করার সিদ্ধান্ত।

খামারে বর্তমানে ১০ জন শ্রমিক ও একজন পশু চিকিৎসক থাকলেও তিনি নিজে দিনরাত সময় দেন। খামারের দুধ পাইকারী বিক্রি হয় না, এলাকায় ৫০ টাকা লিটার দরে খামার থেকে দুধ বিক্রি করা হয়।

তাওহীদ পারভেয নিজেই খামারের জন্য উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন হাট ঘুরে বিদেশী জাতের শৌখিন গরু কিনে আনেন। কুরবানী ঈদের পর খামারে গরুর সংখ্যা ১ হাযার এবং দুগ্ধ খামারে ৫০০ গাভী যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে তার। তার খামারে ভুসি, ঘাস ও খইল ছাড়া অন্য কোন ভিটামিন খাওয়ানো হয় না। এতে খামারের গরুর শরীরে চর্বি কম, গোশত বেশি থাকে। ফলে খামারের গোশতের স্বাদ বেশি।

খামার নিয়ে অনেক বড় স্বপ্ন দেখেন তাওহীদ। খামারের গরু থেকে গোশত প্রক্রিয়াজাত করে বিদেশে রপ্তানি এবং ডেইরী ফার্ম থেকে দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের ইচ্ছা আছে তাঁর।

রাজস্থানের দুম্বা-ছাগলে বদলে গেছে সোহেলের স্বপ্ন

পাবনার ঈশ্বরদী উপযেলায় দুম্বার খামার করে সফলতা পেয়েছেন সোহেল হাওলাদার নামে এক যুবক। পাঁচ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম আজ তাকে স্বপ্ন ছোঁয়ার আশা দেখাচ্ছে। প্রতি বছর খরচ বাদে প্রায় ১৫ লাখ টাকা আয় করছেন তিনি। দুম্বার পাশাপাশি খামারে মূল্যবান তোতাপুরি, হরিয়ানা, পাকিস্তানী বিটল ও দেশীয় মোট ৮০টি ছাগল প্রজাতির প্রাণী রয়েছে। সোহেল এখন পরিকল্পনা করছেন উট পালনের।

উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে পিতার সাথে ভারত থেকে পণ্য আমদানির ব্যবসায় নেমে পড়েন। রাজস্থানে যেয়ে সে দুম্বা ও তোতাপুরি পালনে আগ্রহী হন। বাড়িতেই গড়ে তোলেন ছোট পরিসরে খামার।

সোহেল জানায়, এখন তার খামারে ৩৪টি দুম্বা, ৮টি তোতাপুরি, ৬টি পাকিস্তানী বিটল, ১৫টি হরিয়ানাসহ মোট ৮০টি মূল্যবান প্রজাতির ছাগল রয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের কাছে যার বেশ চাহিদা রয়েছে।

তিনি আরো জানান, ইতিমধ্যে খামারে দুম্বাসহ অন্যান্য প্রজাতির অনেক বাচ্চা হয়েছে। তিনি এখন নিজেই নিয়মিত দুবাই, সঊদী আরব ও ভারতের রাজস্থান থেকে এগুলো আমদানি করার পর প্রতিপালন করে বিক্রি করছেন। বড় সাইজের দুম্বা দেড় থেকে দুই লাখ টাকা, তিন মাস বয়সী এক লাখ টাকা এবং ছয় মাস বয়সী এক লাখ ২০ হাযার টাকায় বিক্রি করছেন। তোতাপুরি ও হরিয়ানা জাতের বাচ্চা ৩০-৩৫ হাযার টাকা এবং বড় ৬০-৮০ হাযার টাকায় বিক্রি করছেন। পাকিস্তানি বিটলের বাচ্চা ৫০ হাযার আর বড় এক লাখ টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রি হচ্ছে। দুম্বা পাঁচ মাসে একটি কোন কোন ক্ষেত্রে দু'টি বাচ্চাও প্রসব করে। দেড় বছরে দুইবার বাচ্চা পাওয়া যায়। আর এসব বাচ্চা বিক্রির উপযোগী হ'তে বেশি সময় লাগে না। এদের পেছনে খাদ্যের খরচও খুব বেশি লাগে না। ফলে লাভটা একটু বেশিই থাকে।

সোহেল জানান, দুম্বাসহ এসব সুন্দর প্রাণী প্রতিপালনে তেমন কষ্ট নেই এবং অসুখ-বিসুখও কম হয়। প্রতিদিন খাবার খায় ৪০ থেকে ৪৫ টাকার। সময়মতো ভ্যাকসিন দিলে ঠিকমতো বেড়ে ওঠে। এ জন্য এটি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। তিনি নিজে এবং দু'জন কর্মচারী খামার দেখাশোনা করেন। বর্তমানে বাংলাদেশের সব খানেই তিনি দুম্বা সরবরাহ করছেন এবং বছরে খরচ বাদ দিয়ে প্রায় ১৫ লাখ টাকা মুনাফা অর্জন করছেন। বিশেষ করে কুরবানী দেয়ার জন্য অনেক বেশি দামে মানুষ সখ করে দুম্বা ক্রয় করেন। দুম্বাসহ এসব দামী প্রজাতির ছাগলের ব্যবসা করে সৎ পথে সফল হওয়ার স্বপ্ন এখন তার বাস্তবায়নের পথে।

ঈশ্বরদী উপযেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ডা. রফীকুল ইসলাম বলেন, দুম্বা মূলত মরু অঞ্চলের প্রাণী। তবে বাংলাদেশের পরিবেশগত কোন সমস্যা নেই। চরাঞ্চল দুম্বা পালনের জন্য উপযোগী। দুম্বা পালন একটি লাভজনক পেশা। সোহেলের মতো আরো যুবক এগিয়ে এলে দেশে বেকার সমস্যা কমে যাবে। ॥সংকলিত॥

কবিতা

মৃত্যু তোমাকে

-আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

আজি এক্ষণে
তব কথা মনে পড়ে
তুমি যে কেমন জানে না তো মন
তবু বারে বারে স্মৃতিতে পড়ে।
তোমা করি ভয় অতি বিস্ময়
পালাতে পারি না মোটে
হিমাদ্রীর কোলে পারাবার তরে
লুকালে কিবা ঘটে।
পাবে না মুক্তি যদিও যুক্তি
ভক্তিতে ভরপুর
হবে ধরা দিতে যেতে কবরেতে
এতটুকু রবে না দূর।
হবে হবে যেতে রবে না ধরাতে
তব এতটুকু শুধু দাবী
মৃত্যু যন্ত্রণা দিও না প্রভু
আমাকে দিয়ো গো মাপি।
মরণের শেষে যেয়ে নিজ দেশে
শান্তিতে যেন থাকি
মম হৃদি মন করিয়া স্মরণ
আল্লাহকে যেন দেখি।

যুগের মুওয়াযযিন

-ইউসুফ আল-আযাদ
প্রভাষক, হাবলা-টেংগুরিয়া পাড়া ফাযিল মাদ্রাসা
বাসাইল, টাঙ্গাইল।

সোনালী যেদিন অতীত হয়েছে ফিরাও আবার সেই সেদিন
মিনার হ'তে আযান হাঁকাও জাগো যুগের মুওয়াযযিন।
জাগো জাগো জাগো ওহে জেগে ওঠো আজই
দ্বীন বাঁচাতে জীবন দিতে কে আছো ভাই রাজী?
উন্নত শির শীর্ষে তুলো তোমরা যারা নওজোয়ান
জোর কদমে সামনে বাড়ো আসুক যতই ঝড়-তুফান।
মনযিল আর নয় কো দূরে ঐ যে দেখ দিন উজ্জ্বল
শির উঁচিয়ে সামনে চলো নতুন পথের যাত্রীদল।
সকল বাধা লোটাক পায়ে টুটাও সকল বাধার ক্ষণ
যতই আসুক বিপদ-আপদ শক্ত করো এবার মন।
গাহ গাহ হে মুওয়াযযিন শিকল ছেঁড়ার সেই সে গান
আজকে সবাই আযাদ করো বন্ধ খাঁচার অন্ধ প্রাণ।

ছহীহ সুন্নাহ্র পথ

-মুহাম্মাদ মুবাশ্শিরুল ইসলাম
নওদাপাড়া মাদ্রাসা, রাজশাহী।

আল্লাহ্র তো আকার আছে নিরাকার তিনি নন
এই জগতের প্রতিপালক হয়ে কেমনে নিরাকার হন?
মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন রাসূলে পাক (ছাঃ)
নূরের তৈরীর ভুল ধারণা সকলের ঘুঁচে যাক।
আল্লাহ ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) কখনই এক নন
তথাপি কেন এক কাতারে লেখা হয় তাঁদের নাম?
ছালাত শেষে সম্মিলিত মুনাজাতের হাদীছটা কোথায়
তবু কেন ছালাত শেষে দলবদ্ধ মুনাজাত করা হয়?
শবেবরাতের ফযীলত কোথায় পেলাম ভাই?
ঈদে মিলাদুন্নবীরও কোনই ছহীহ ভিত্তি নাই।
জুম'আর দিনের আরবী খুৎবা কেন চলে আজ
লালবাতি জ্বালিয়ে সুন্নাতে বারণ এ কেমন কাজ?
শেখ সাদীর কবিতা কেন দরূদ হয়ে যায়
রাসূল (ছাঃ)-এর দরূদ ছাড়া কেন এটা পড়া হয়?
সমাজে আছে আরও অনেক ভ্রান্ত মতবাদ
এসব ছেড়ে ধরো সবে ছহীহ সুন্নাহর পথ।

ওরস

-মুহাম্মাদ মুসাফির বাশার

মস্তক বুলিয়া পড়িল ঢলিয়া বুঝি নাই কারি তলে
বুঝবে কেমনে জাগিয়া ঘুমাইলে অন্তর নাহি জাগে।
আমীর বনিয়া ফকীর হইয়া রাখাল হইয়াছে রাজা
কদমবুসি চলিছে তথায় পণ্ডিত করেছে পূজা।
যে জ্ঞান লইয়া বিশ্বময় গড়িবে যাহারা দেশ
মূর্খ বনিছে মহাপণ্ডিত হায় জ্ঞানীরা নিরুদ্দেশ।
মানব হইয়া পড়িছে লুটিয়া মোহের লোলুপ টানে
ভণ্ডরা সবে সাধক বনেছে সাধকেরা ভয়ে ছোটে।
এমন করিয়া কতকাল ধরিয়া চলিবে এই খেলা
সাহস করিয়া মস্তক তুলিয়া মুষ্টি বাঁধিবে কেবা?
জগৎটা হায় পড়িছে লজ্জায় নির্বোধ হয়েছে সবে
কদমবুসি করিতেছে আদমে আদমে বিবেকে নাহি লাগে।
সৃষ্টি করিয়া যে স্রষ্টা তোমায় দিয়েছেন অনন্য বেশ
তাহাকে ভুলিয়া কেমন করিয়া মাযারে যাও অহর্নিশ।

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

স্বদেশ

ইস্রাঈলে কোন বাংলাদেশী গেলে শাস্তি পেতে হবে : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, ইস্রাঈলকে দেশ হিসাবে স্বীকার করে না বাংলাদেশ। তাই সেখানে কোন বাংলাদেশী গেলে তাঁর শাস্তি পেতে হবে। রাজধানীর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় গত ২৬শে মে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা বলেন। ফিলিস্তীনকে ওষুধসামগ্রী উপহার হস্তান্তর অনুষ্ঠানের পর তিনি এ মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত ফিলিস্তীনের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ এস ওয়াই রামাদান, পররাষ্ট্রসচিব মাসউদ বিন মোমেন ও বিকন ফার্মাসিউটিক্যালসের এমডি এবাদুল করীম।

আব্দুল মোমেন বলেন, বাংলাদেশ ফিলিস্তীনের পরীক্ষিত বন্ধু। ১৯৭২ সাল থেকেই আমরা তাদের পাশে থেকেছি। আমরা ইস্রাঈলকে দেশ হিসাবে স্বীকার করি না। যত দিন আমরা ইস্রাঈলকে স্বীকৃতি না দিচ্ছি, তত দিন কোন বাংলাদেশী সেখানে যেতে পারবেন না। কোন বাংলাদেশী সেখানে গেলে শাস্তি পেতে হবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের কোন কোন গণমাধ্যম পাসপোর্ট সংশোধন নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করছে। তবে ইস্রাঈল নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান খুব সুস্পষ্ট। ফিলিস্তীন নীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান পরিবর্তন হয়নি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্র অনুযায়ী, মাস ছয়েক আগে বাংলাদেশ সরকার ই-পাসপোর্ট থেকে ইস্রাঈল প্রসঙ্গটি বাদ দেয়। বাংলাদেশের ই-পাসপোর্ট থেকে ইস্রাঈল ছাড়া সব দেশে ভ্রমণ করা যাবে কথাটি বাদ পড়ায় হতাশা প্রকাশ করেছিলেন ঢাকায় ফিলিস্তীনী রাষ্ট্রদূত। বাংলাদেশ সরকার বলছে, বাংলাদেশের নাগরিকদের ইস্রাঈল ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে। এ পরিবর্তন করা হয়েছে পাসপোর্টের আন্তর্জাতিক মানের স্বার্থে।

অনুষ্ঠানে বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস থেকে পাওয়া ৪০ লাখ টাকা মূল্যের ওষুধসামগ্রী ফিলিস্তীনকে উপহার দেওয়া হয়। ইস্রাঈলের সাম্প্রতিক হামলায় ফিলিস্তীনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য এসব ওষুধসামগ্রী সরবরাহ করা হবে। এছাড়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফিলিস্তীনীদের জন্য মানবিক সহায়তা হিসাবে ৫০ হাযার ডলার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ সহায়তার জন্য ঢাকায় ফিলিস্তীনের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ এস ওয়াই রামাদান বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

[পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায় আমরা খুশী। কিন্তু Except Israel বা 'ইসরায়েল ব্যতীত' কথাটি পাসপোর্ট থেকে উঠানোর প্রয়োজন হ'ল কেন? এর কোন সদুত্তর নেই। অতএব এতে সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে যে, পারস্পরিক ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ খোলা থাকবে। অন্যান্য যোগাযোগ বন্ধ থাকবে। আর ইস্রাঈল তো ব্যবসাই চায়। যা ইতিমধ্যে ঢাকার সাথে চালু হয়ে গেছে। ইহূদী রাষ্ট্র বাংলাদেশের সাথে ব্যবসা করে ফুলে-ফেঁপে উঠুক ও সেখানকার ফিলিস্তীনীদের নির্যাতন করুক, এমন কোন কাজে আমরা সমর্থন দিতে পারিনা। অতএব এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হউক (স.স.)]।

সৈকতে লাল জোয়ার

সাগরের পানিতে অক্সিজেন শূন্যতার কারণে পানিতে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, সেটি 'লাল জোয়ার' নামে পরিচিত। ক্রমাগত তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে এবং দীর্ঘদিন বৃষ্টিপাত না হ'লে সাগর ও নদীতে এক ধরনের ক্ষতিকর উদ্ভিজ্জ অনুজীব বিস্তার করে। এই অনুজীবগুলি পানির কলামে মিশে থাকা অক্সিজেন উপরের দিকে তুলে আনে। যার কারণে পানির নীচের দিকে অক্সিজেন শূন্যতার তৈরী হয় এবং পানিতে বিষাক্ততা ছড়িয়ে পড়ে। তখন বিষয়টি জলজ প্রাণীর জন্য মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। যাকে 'লাল জোয়ার' বলা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাগরগুলিতে মাঝে-মধ্যেই এমন লাল জোয়ার-এর ঘটনা ঘটে।

এ লাল জোয়ারই সম্প্রতি বঙ্গোপসাগরে ঘন ঘন তিমি মৃত্যুর অন্যতম কারণ হ'তে পারে মনে করা হয়। নদীর মিঠা পানি যখন সমুদ্রের লোনা পানির সাথে মিশে, তখন সেটি সমুদ্রের পানির কলামে হরিজন্টালি বা আনুভমিকভাবে স্তর পুনর্বিন্যাস (স্ট্রেটিফিকেশন) না করে ভার্টিক্যালী বা উল্লম্বভাবে বিন্যস্ত হ'লেই সাগরের পানিতে অক্সিজেন শূন্যতা তৈরি হয়। যেটি 'লাল জোয়ার' নামে পরিচিত।

সাগর থেকে মাঝে-মধ্যেই এমন গেঁজাপূর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা পানি ও আবর্জনা ভেসে আসে। কিন্তু গত প্রায় এক মাস ধরে যে ঘটনা দেখা যাচ্ছে, তা আগে কখনও দেখা যায়নি। গত প্রায় ২/৩ মাস ধরেই কক্সবাজারের সাগরের পানি ঘোলাটে রয়েছে। যে কারণে মাছও ধরা পড়ছে খুব কম। এছাড়া গত এপ্রিল মাসের শেষ দিকে কক্সবাজারের চিংড়ী পোনা উৎপাদনকারী হ্যাচারিগুলির প্রায় দেড়'শ কোটি পোনা মারা যাওয়ার ঘটনায় সাগরের এ বিষাক্ত পানিই কারণ বলে মনে করছেন হ্যাচারি মালিকেরা। কক্সবাজারের আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, গত ৬ মাসে কক্সবাজারে কেবল একবারই সামান্য বৃষ্টিপাত হয়েছে। যে কারণে গত মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই তাপমাত্রা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। কয়েকদিন ধরে তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রির উপরে ওঠানামা করছে।

[সরকারের নদী রক্ষা কমিশনের উচিৎ, গুরুত্বের সাথে বিষয়টি বিবেচনা করা। কারণ এর মধ্যে মানুষ ও প্রাণীজগতের জীবন-মৃত্যুর সম্পর্ক রয়েছে (স.স.)]।

পাহাড়ে পানির সঙ্কট

গত কয়েক মাস ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন যেলা রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ির বিভিন্ন স্থানের মানুষ খাবার পানির তীব্র সঙ্কটে রয়েছে বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশ। এমনকি অনেক স্থানে দৈনন্দিন ব্যবহারের পানিও পাচ্ছে না মানুষ। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে নানা প্রচেষ্টা চলছে।

গত বছর ২০২০ সালে খাগড়াছড়ির জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের বিভিন্ন দুর্নীতি নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল একটি বেসরকারী টেলিভিশন। 'পানি বেঁচে জমিদার' শিরোনামের প্রতিবেদনটি দেখে আঁৎকে উঠা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। আসলে পাহাড়ের মানুষের পানি সঙ্কট মোকাবিলায় আসা কোটি কোটি টাকা কিভাবে হরিলুট হচ্ছে তার চিত্রই ফুটে উঠেছে প্রতিবেদনটিতে। এই অবস্থা কি শুধু খাগড়াছড়ির? বাকী দুই যেলাতে কি এই ধরনের অনিয়ম হচ্ছে না? সেটা বিশ্বাস করা যায় কীভাবে? কারণ, বান্দরবান এবং রাঙামাটির বাসিন্দাদেরও একই সঙ্কট মোকাবিলা করতে হচ্ছে। সেখানেও তো পানির জন্য হাহাকার চলছে।

সম্প্রতি পানি সঙ্কটের সবচেয়ে করুণ চিত্রগুলি গণমাধ্যমে এসেছে আলীকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি ও দীঘিনালা থেকে। একটি পাতকুয়া বা একটি টিউবওয়েলের পাশে শতাধিক পানির কলসির লাইন সত্যিই বেদনাদায়ক। এর প্রকৃত কারণ বের করতে হলে ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন। তবে আপাত দৃষ্টিতে যা দেখা যায়, তাতে ধারণা করা যায় যে, নিম্নোক্ত কারণ সমূহের ফলে পাহাড়ে পানির সঙ্কট বাড়ছে। যেমন (১) পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়গুলি এখন অনেকটাই বৃক্ষহীন, যেদিকেই তাকানো যায় ন্যাড়া পাহাড় চোখে পড়ে। কোন

কোনো স্থান থেকে অবাধে তোলা হচ্ছে পাথর। অথচ পাহাড়ের পরিবেশের আর্দ্রতা রক্ষায় বৃক্ষের কোন বিকল্প নেই। আর ঝর্ণার উৎস পাথরও আজ নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। এর ফলে এখানকার পরিবেশ আজ চরম বিপর্যয়কর হয়ে উঠছে। তাই বর্ষায় অতি বৃষ্টি, গ্রীষ্মে অতি খরা পাহাড়ের নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হচ্ছে। বাস্তবভিত্তিক ব্যাপক পরিকল্পনা ছাড়া এর থেকে উত্তরণের কোন উপায় নেই। (২) পাহাড়ের পানির সবচেয়ে বড় উৎস কাপ্তাই লেকও আজ বিপন্ন। বর্ষায় পাহাড়ী ঢলের সাথে আসা বিপুল পলিমাটি তলায় জমা হওয়ার কারণে লেকের গভীরতা প্রতিনিয়তই কমছে। ফলে লেকের পানি ধারণ ক্ষমতাও কমে গেছে আশঙ্কাজনকভাবে। এই অবস্থায় কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প সচল রাখতে শুষ্ক মৌসুমে লেকের তলা পর্যন্ত শুকিয়ে ফেলতে হচ্ছে। এটাও এর চারপাশের পাহাড় বা সমভূমির স্বল্প গভীরের পানির স্তর মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার আরও একটি কারণ হ'তে পারে। তাই কাপ্তাই লেকের গভীরতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। (৩) পাহাড়ের বিভিন্ন ঝর্ণা বা নালাগুলির পাশে বাঁধ দিয়ে বর্ষার পানি ধরে রেখে শুষ্ক মৌসুমে ব্যবহারের পরিকল্পনাও করা যেতে পারে। (৪) অবাধে পাথর উত্তোলন বন্ধ করতে হবে। (৫) ব্যাপক ভিত্তিতে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পাহাড়গুলিকে আবারও সবুজে ঢেকে দিতে হবে। (৬) রাঙ্গামাটি যেলার কাপ্তাই উপযেলা সহ পার্বত্য যেলাগুলির যেসব স্থানে স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও কোন ডীপ টিউবওয়েল বসেনি এবং যেখানকার মানুষ পানির অভাবে হাহাকার করছে, সেসব স্থানে অনতিবিলম্বে ডীপ টিউবওয়েল বসাতে হবে। (৭) সর্বোপরি সরকারী পরিকল্পনা এবং বরাদ্দের সুফল পেতে হলে 'পানি বেঁচে জমিদার' হওয়া চোরদের সরাতে হবে। কেননা দুর্নীতিবাজদের মাধ্যমে লক্ষ-কোটি টাকা খরচ করেও সুফল পাওয়ার আশা করা যায় না।

[উক্ত পরামর্শগুলি সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন বলে আশা করি (স.স.)]।

সূর্য ডিম : বিশ্বের সবচেয়ে দামী আমের চাষ হচ্ছে বাংলাদেশে

টকটকে লাল রঙ ও আকারে বড় হওয়ায় এই আম 'এগ অব দ্য সান' বা 'সূর্য ডিম' নামে পরিচিত। বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণের পার্বত্য যেলা খাগড়াছড়িতে চাষ হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে দামী আম, যার প্রতি কেজি খুচরা বাযারে ৮০০ থেকে ১০০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই আম ৫০০০-৬০০০ টাকায় বিক্রি হয়ে থাকে।

দামী এই আমটি বাংলাদেশের কোন জাত নয়। আমটি জাপানি প্রজাতির বলে জানিয়েছেন কৃষি কর্মকর্তারা। এই আমের গড়ন সাধারণ আমের চাইতে বড় ও লম্বা, স্বাদে মিষ্টি এবং আমের বাইরের আবরণ দেখতে গাঢ় লাল অথবা লাল-বেগুনির মিশ্রণে একটি রঙের। এককেটি আমের ওযন হয় ৩৫০-৪৫০ গ্রামের মতো। দামী এই আমটি চাষ করে ইতিমধ্যে সাড়া ফেলেছেন খাগড়াছড়ির কৃষক হ্ল্যাশিংমং চৌধুরী। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে কৃষিকাজকে নিজের পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেন তিনি। খাগড়াছড়ি যেলা সদর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে মহলছড়ি উপযেলা। ঐ উপযেলার ধুমনিঘাট এলাকায় ১২শ ফুট উঁচুতে ৩৫ একর জায়গাজুড়ে নিজ উদ্যোগে তিনি গড়ে তুলেছেন হরেক রকম ফলের বাগান।

২০১৭ সালে তিনি প্রথম ভারত থেকে এই আমের ১০/১৫টি চারা কিনে নিজ বাগানে রোপণ করেন। এখন তার বাগানে সূর্য ডিমের ১২০টির মতো গাছ রয়েছে, যা থেকে প্রতি বছর ৩শ থেকে ৪শ কেজি আম হয় বলে জানিয়েছেন হ্ল্যাশিংমং।

প্রতি কেজি আম ৩০০ থেকে ৫০০ টাকায় বিক্রি করলেও এই আম খুচরা বাযারে গিয়ে দ্বিগুণ হয়ে যায়।

হ্ল্যাশিংমং তার বাগানে প্রায় ৬০ জাতের আম সেই সঙ্গে ড্রাগনফল, রামবুটান, থাইলংগান, মালটাসহ প্রায় ১৫০ জাতের প্রচলিত-অপ্রচলিত-বিলুপ্ত জাতের ফল চাষ করে আসছেন।

তবে তার বাগানে যে আমের ফলন হচ্ছে সেটা বিশ্বমানের কি-না, এর স্বাদ জাপানের উৎপাদিত মিয়াজাকি আমের মতো কি-না, সেটা তিনি বিশেষজ্ঞদের কাছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছেন।

যে গাছে আলু, সে গাছেই বেগুন

শিরোনাম দেখে বিস্মিত হ'লেও ঢাকাস্থ 'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস, এগ্রিকালচার অ্যাণ্ড টেকনোলজি'র (আইইউবিএটি) একদল গবেষক একই গাছে আলু ও বেগুন উৎপাদন করার মতো গবেষণায় সফল হয়েছেন। জোড় কলম পদ্ধতিতে এটি সম্ভব হয়েছে। আইইউবিএটির গবেষক দল বেগুনের ইংরেজী পরিভাষা 'ব্রিঞ্জাল' আর 'আলু' একত্র করে গাছটির নাম দিয়েছে 'ব্রিঞ্জালু' বা 'বেগুনালু'। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে শুরু হয় এই গবেষণা। গবেষক দলের নেতৃত্ব দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগের অধ্যাপক আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ফারূক।

ক্যাম্পাসের ছোট্ট এক টুকরো জমিতে শুরু হয় গাছ লাগানো ও পরিচর্যার প্রথম ধাপ। শুরুতে বেগুনের চারা রোপণ করা হয়। আর ২৫ থেকে ৩৫ দিনের মধ্যে রোপণ করা হয় আলুর চারা গাছ। এর ২০ থেকে ২৫ দিন পর দেখা যায়, দুই গাছের ডালের ব্যাস প্রায় সমান হয়ে গেছে। সে সময় বেগুনগাছ থেকে সায়ন সংগ্রহ করে আলুগাছের রুটস্ট্রোকের সঙ্গে জোড়া কলম পদ্ধতিতে যুক্ত করা হয়। নির্দিষ্ট সময় পর কলমের র‍্যাপিং খুলে ফেলা হয়। ৪০ থেকে ৬০ দিনের মাথায় নতুন এই গাছে ফুল আসতে শুরু করে। ৭০ দিনের মধ্যেই ফলন হয় বেশির ভাগ গাছে।

নতুন এই উদ্ভাবনের সুফল ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ফারূক বলেন, আমাদের দেশে প্রতিবছর কৃষিজমির পরিমাণ কমে আসছে। তাই একই জমিতে একই গাছ থেকে যদি কম সময়ে দুই ধরনের ফসল উৎপাদন করা যায়, তা আমাদের কৃষিব্যবস্থায় বড় ভূমিকা রাখবে। ব্রিঞ্জালু উৎপাদনের পুরো প্রক্রিয়াতেই প্রাকৃতিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়া সেচসহ অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রেও একই গাছ হওয়ায় একবারই খরচ হচ্ছে।

বিদেশ

তিমির পেটে গিয়ে ৩০ সেকেণ্ড পর জীবিত বেরিয়ে এলেন আমেরিকান ডুবুরী

যুক্তরাষ্ট্রের একজন লবস্টার চিংড়ী শিকারীকে গিলে ফেলেছিল বিশাল আকৃতির একটি হ্যাম্পব্যাক তিমি। তবে তিমির পেটে গিয়েও সৌভাগ্যক্রমে জীবন্ত ফেরেন তিনি। মাইকেল প্যাকার্ড নামের ঐ ব্যক্তি ৩০ থেকে ৪০ সেকেন্ড ছিলেন মাছটির পেটে। মাছটি নিজের লালার সঙ্গে বের করে দেয় মাইকেলকে। আর এভাবেই বিশালাকৃতির প্রাণীটির পেটে গিয়েও শেষ পর্যন্ত বেঁচে

যান প্যাকার্ড। আধা মিনিটের বেশি সময় প্রাণীটির পেটে থাকলেও শুধুমাত্র গোড়ালিতে হাল্কা চোট পেয়েছেন তিনি। ৪০ বছর ধরে কেপ কডে ডুবুরির কাজ করেন মাইকেল। পাশাপাশি তিনি লবস্টার বা বড় আকারের চিংড়ীও শিকার করেন।

মাইকেল জানান, তিনি ও তার সহযোগী নৌকায় করে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের হেরিং কোভ সৈকতে যান। সেখানেই স্কুবা গিয়ার নিয়ে নৌকা থেকে পানিতে ঝাঁপ দেন। ঝাঁপ দিতেই বিশাল একটা ধাক্কা অনুভব করেন। এরপরই সব অন্ধকার হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারেন যে, তিনি তিমির মুখের ভেতরে চলে গিয়েছেন। বেঁচে থাকার আশা তখন প্রায় শেষ। ঠিক সেই সময় বাতাসে ছুঁড়ে ফেলা হয় তাকে। এরপর তার সহযোগী তাকে নৌকায় তুলে নেন। পুরো ঘটনাটি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছেন না বলে জানান মাইকেল।

হ্যাম্পব্যাক তিমি ৫০ ফিট পর্যন্ত লম্বা হ'তে পারে এবং একেকটির ওযন হ'তে পারে প্রায় ৩৬ টন। ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ডের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বে এ রকম তিমির সংখ্যা প্রায় ৬০ হাযার। এরা সাধারণত মুখ যতটা সম্ভব হা করে মাছ বা অন্য খাবার খেয়ে থাকে।

[এর দ্বারা যেন কেউ ইউনুস (আঃ)-এর মাছের পেটে যাওয়া ও বেঁচে যাওয়াকে সাধারণ ঘটনা বলে মন্তব্য না করেন। কারণ কুরআনে বর্ণিত উক্ত ঘটনার প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। এতে মানুষের শিক্ষণীয় এই যে, তার চাইতে অনেক বড় বড় সৃষ্টজীব আল্লাহর রয়েছে, যা তারা জানেনা। অতএব তাদের উচিৎ আল্লাহর প্রতি অনুগত হওয়া (স.স.)]।

মুসলিম জাহান

ভ্যাকসিন নেওয়া মাত্র ৬০ হাযার সঊদী নিয়েই অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবারের হজ্জ

মহামারির মধ্যে দ্বিতীয়বারের মত হজ্জ পালন শুধু সে দেশের নাগরিকদের মধ্যে সীমিত রাখল সঊদী আরব। সঊদী আরবের নাগরিক এবং সঊদী আরবে অবস্থানকারী অন্যান্য দেশের নাগরিকদের নিয়ে সীমিত আকারে এবারের হজ্জ পালিত হবে। ইতিমধ্যে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারী করা হয়েছে। আর এর ফলে বিদেশ থেকে এবারও কেউ হজ্জ পালনের জন্য সে দেশে যেতে পারবেন না। প্রতিবেদন অনুযায়ী, যে সমস্ত মানুষ সে দেশের হজ্জে অংশ নেবেন তাঁদের অবশ্যই দু'টি ভ্যাকসিনই নেওয়া থাকতে হবে।

সে দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তৌফিক আল-রাবিয়াহ এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন, একাধিক দেশে কোভিডে আক্রান্তের সংখ্যা এখনও মারাত্মক। সেই সঙ্গে ভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্টের কারণে নতুন আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আর এসব কারণে হজ্জ দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত। উল্লেখ্য, গত বছরও হজ্জে কোন বিদেশীদের ঢোকার অনুমতি ছিল না। দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এবারও সে পথেই হাঁটল দেশটি।

আল-আকছা রক্ষা আন্দোলনে কুরআনের যে শিক্ষিকা ৭ বছরে ২৮ বার গ্রেফতার হন

খাদীজা খোওয়াইস, যিনি পবিত্র মসজিদ আল-আকছা রক্ষায় দখলদার ইস্রাঈলী বাহিনীর হাতে এখন পর্যন্ত ২৮ বার গ্রেফতার হয়েছেন। ইস্রাঈলের হাত থেকে আল-আকছা রক্ষায় নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন ৪৪ বছর বয়সী এই মুসলিম নারী। ২০১৪ সাল থেকে গত ৭ বছরে আকছায় ইস্রাঈলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিটি আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন খাদীজা। যেরুযালেম নিবাসী এই নারী মাসজিদুল আকছায় কুরআন মাজীদ শিক্ষা দেন ফিলিস্তিনীদের। মসজিদের পাশেই পরিবারসহ বাস করেন তিনি। ৩ মেয়ে ও ২ ছেলে রয়েছে তার। গোটা পরিবার মাসজিদুল আকছার খাদেম। কুরআন শেখানোর কাজে ইস্রাঈলী বাহিনীর হাতে বারবার আক্রান্ত হয়েছেন খাদীজা। বারবার মামলা ও গ্রেফতারের শিকার হয়েছেন। তবুও ভীত নন খাদীজা। কুরআন শিক্ষাসহ মাসজিদুল আকছায় ইস্রাঈলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন নিয়মিত। এক সাক্ষাৎকারে খাদীজা খোওয়াইস বলেন, ইস্রাঈলী ইহূদীরা মাসজিদুল আকছা থেকে আমাদের যত দূরে সরিয়ে দেয় আমাদের বন্ধন তত দৃঢ় হয় এ মসজিদের সাথে। আমাদের বিশ্বাস তত বৃদ্ধি পায়। আমরা সত্যের ওপর আছি। তারা যত বেশি কঠোর হয় আমাদের বিশ্বাস তত দৃঢ় হয় যে, আমরা সঠিক পথে আছি।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

মহাকাশের প্রথম পর্যটক টিটোর ভ্রমণ অভিজ্ঞতা

মার্কিন কোটিপতি ডেনিস টিটো ২০০১ সালের ৩০শে এপ্রিল রাশিয়ার সয়ুজ রকেটে করে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে গিয়েছিলেন। তিনিই বিশ্বের প্রথম মহাকাশ পর্যটক। ওই সময় তাঁর বয়স ছিল ৬০ বছর। তিনি বলেন, আমি মহাকাশের গাঢ় অন্ধকার ও দূরে পৃথিবীর বক্রতা চোখে পড়ল। আমি উচ্ছ্বসিত ছিলাম। এটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা।

[দেড় হাযার বছর পূর্বে মাক্কী সূরা হা-মীম সাজদাহ ও দুখানে এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে, আকাশ মণ্ডল ধূম্রকুণ্ড বিশেষ। যা গভীর অন্ধকার। আধুনিক বিজ্ঞান যা এখন প্রমাণ করে দিচ্ছে (স.স.)]।

অল্প খরচের অক্সিজেন প্ল্যান্ট বানাল ১০ম শ্রেণীর ছাত্র তাহের মাহমূদ

পাবনার ঈশ্বরদীর সরকারী এস এম মডেল হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র তাহের মাহমূদ তারীফ। প্রায় এক বছর আগে তার পিতা আব্দুস সালাম অক্সিজেনের অভাবে মারা যান। তখন দরিদ্র ঘরের সন্তান তাহের মাহমূদ পিতার জন্য কিছুই করতে পারেনি। ফলে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল স্বল্প খরচে অক্সিজেন তৈরী করবে। ফলে মাত্র দুই সপ্তাহ চেষ্টার মাধ্যমে সে অক্সিজেন উৎপাদন প্ল্যান্ট তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে। খরচ হয়েছে মাত্র ৬৫ হাযার টাকা। ডায়নামো দিয়ে বাতাসকে প্রথমে একটি সিলিণ্ডারে প্রবেশ করানো হয়। বাতাসে অক্সিজেন ছাড়াও অন্যান্য উপাদান থাকায় সেগুলো বের করার জন্য জিওলাইট ব্যবহার করা হয়েছে। জিওলাইটের মাধ্যম বাতাস থেকে অক্সিজেনকে একদিক দিয়ে এবং অন্যান্য উপাদানকে আরেক দিক দিয়ে বের করা হয়।

সে জানায়, ঈশ্বরদী উপযেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) তত্ত্বাবধানে এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সে তার গবেষণায় সফলতা অর্জন করেছে। তার আবিষ্কৃত প্ল্যান্টে অক্সিজেন উৎপাদন ল্যাবরেটরী টেস্টে সফল। এখন কম খরচে বৃহত্তর পরিসরে দেশে বিপুল পরিমাণ অক্সিজেন উৎপাদন করার বিষয়ে সে আশাবাদী।

[দেশের রত্ন এইসব ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের উৎসাহ দিয়ে বৃহত্তর পরিসরে অবদান রাখার সুযোগ দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি জোরালো আবেদন জানাচ্ছি (স.স.)]।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আলোচনা সভা

জাহানাবাদ, মোহনপুর, রাজশাহী ৯ই মে রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন জাহানাবাদ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আন্দোলন' মোহনপুর উপযেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন' -এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মুমিন ও মাওলানা মুমতাযুদ্দীন (নাটোর)।

হোসেনপুর, মান্দা, নওগাঁ ২৯শে মে শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার মান্দা উপযেলাধীন হোসেনপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আন্দোলন' হোসেনপুর শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ রায়হানুযযামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শাখা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুনতাছির আহমাদ।

মজিদপুর, মান্দা, নওগাঁ ২৯শে মে শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মান্দা উপযেলাধীন মজিদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আন্দোলন' মজিদপুর শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছানাউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রায্যাক।

তা'লীমী বৈঠক

চাঁইসারা, বাগমারা, রাজশাহী ১৮ই মে মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার বাগমারা উপযেলাধীন চাঁইসারা পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আন্দোলন' হাটগাঙ্গোপাড়া এলাকার উদ্যোগে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও বাড়ীগ্রাম দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক (অব.) মাস্টার শাহার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তা'লীমী বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন নরদাশ এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ ইব্রাহীম হোসাইন, রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ২য় বর্ষের ছাত্র আবু রায়হান ও অত্র মসজিদের খতীব আব্দুল মান্নান।

ঈদ সামগ্রী ও ফিৎরা বণ্টন

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১০ই মে সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে এবং 'আল-হুদা ট্রাস্ট' লণ্ডন-এর অর্থায়নে ঈদুল ফিৎর উপলক্ষ্যে অত্র এলাকার ৩০০ এবং কাজলা (মতিহার থানা) এলাকার ১০০ মোট ৪০০ দরিদ্র পরিবারের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এ ঈদ সামগ্রীর মধ্যে ছিল চাউল, চিনি, সেমাই, তেল ইত্যাদি। ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম প্রমুখ।

অতঃপর ঈদ শেষে ১৮, ১৯ ও ২০শে মে রোজ মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে স্থানীয় ৫৮০টি দরিদ্র পরিবারের মাঝে ফিৎরার চাউল বণ্টন করা হয়। এর মধ্যে ২৩৭ পরিবারের মধ্যে ৫ কেজি ও ৩৪৩ পরিবারের মধ্যে আড়াই কেজি করে মোট ২০৪৩ কেজি স্থানীয় সায়েলদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। অবশিষ্ট ফিৎরা আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী ইয়াতীমখানা সহ 'আন্দোলন'-এর অধীনে দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত ইয়াতীমখানা গুলিতে বণ্টন করা হয়। উল্লেখ্য যে, এ বছর স্থানীয় ও প্রবাসী ভাই-বোনদের নিকট থেকে মোট ৬৬৬০ কেজি ফিৎরার চাউল জমা হয়। এর মধ্যে সঊদী আরব শাখা থেকে আসে ৫৮৮০ কেজি।

সোনামণি

হুজরাপুর নিচপাড়া, গোদাগাড়ী, রাজশাহী ২৪শে মে সোমবার : অদ্য সকাল ৭-টায় গোদাগাড়ী উপযেলাধীন হুজরাপুর নিচপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ ইমাম হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও মুঈনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন উপযেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ কামাল হোসাইন।

খলীলপুর, সুজানগর, পাবনা ১১ই জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সুজানগর উপযেলাধীন দারুল হাদীছ মডেল মাদ্রাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ শামীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যন্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কাতার শাখার আহ্বায়ক মুহাম্মাদ আব্দুল কাবীর। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুর রহমান ও জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ ইব্রাহীম। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় মেহমান প্রশিক্ষণের পূর্বে উক্ত মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

মহিলা সংস্থা

দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ

বংশাল, ঢাকা, ৪ঠা জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বংশালস্থ যেলা 'আন্দোলন'-এর কার্যালয়ে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। পর্দার অন্তরালে সমবেত বিভিন্ন শাখা থেকে আগত দায়িত্বশীলা মা-বোনদের উদ্দেশ্যে তিনি 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। পাশাপাশি তিনি মা-বোনদেরকে সাংগঠনিক মানোন্নয়নের জন্য সিলেবাস ভিত্তিক পড়াশুনার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ২৭শে মে বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৩-টায় যেলা কার্যালয়ে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বংশাল এলাকা 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র সভানেত্রী শামসুন্নাহারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা যেলার সভানেত্রী মারিয়াম বিনতে আযীমুদ্দীন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ওয়ারী শাখার সভানেত্রী জান্নাতুল ফেরদৌস।

মৃত্যু সংবাদ

(১) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের শ্বশুর ও ঝাউডাঙ্গা এলাকা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আফসার আলী মোড়ল (৮৯) গত ২১শে মার্চ রবিবার বিকাল ৫.১৫ মিনিটে সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার্ধক্য জনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন)*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র, ৬ কন্যা ও নাতি-নাতনী সহ বহু গুণগ্রাহী রেখে যান। পরদিন বেলা ২-টায় নিজ বাড়ীর সম্মুখস্থ ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন তার কনিষ্ঠ পুত্র ও সাতক্ষীরা সিটি কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন। জানাযায় যেলা ও উপযেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

(২) 'আন্দোলন' শরীয়তপুর যেলার সাবেক সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ মুসলিম তালুকদার (৭০) কিডনী জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৯শে মার্চ সোমবার বেলা সাড়ে ১১-টায় ঢাকাস্থ মীরপুর-৬ য়ে তার মেয়ের বাসায় মৃত্যুবরণ করেন *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন)*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র, ১ কন্যা রেখে যান। ঐদিন বাদ আছর মীরপুর-৬ বাযার মসজিদের সামনে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা আযহারুদ্দীন। জানাযা শেষে তাকে মীরপুর-১১ জান্নাতুল মাওয়া কবরস্থানে দাফন করা হয়।

(৩) 'আন্দোলন' শরীয়তপুর যেলার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (৬০) কিডনী জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১৫ই মে শনিবার সকাল সাড়ে ১০-টায় নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন)*। মৃত্যুকালে তিনি ২ স্ত্রী, ২ পুত্র ও ৬ কন্যা রেখে যান। ঐদিন বাদ আছর শরীয়তপুর সদরস্থ বাটিয়া নামক স্থানে তার বাসভবনের সামনে প্রথম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন তার নাতি হাফেয জুনায়েদ। অতঃপর তার দ্বিতীয় জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত তার জন্মস্থান যেলা শহরের কাকদীতে। জানাযা শেষে তাকে নিজ গ্রাম কাকদীর সামাজিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

(৪) 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাতক্ষীরার বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার শিক্ষক শেখ আব্দুছ ছামাদ (৩৮) গত ২৭শে মে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১-টায় ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ঢাকার ইবনে সীনা হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন)*। মৃত্যুকালে তিনি মা, স্ত্রী, ১ পুত্র, ৪ ভাই ও ১ বোন সহ বহু গুণগ্রাহী রেখে যান। পরদিন দুপুর ২-টায় নিজ গ্রাম সাতক্ষীরা সদর থানাধীন বুলারাটির আল-আমীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদের পার্শ্ববর্তী ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন তার চাচা ও সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম। জানাযায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটির সদস্য যহূরুল ইসলাম, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানসহ সাতক্ষীরা, যশোর, খুলনা ও বাগেরহাট যেলার 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

(৫) 'আন্দোলন' চাঁপাইনবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উপদেষ্টা, সাবেক সহ-সভাপতি ও প্রসাদপুর কামিল মাদ্রাসার সাবেক প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা আব্দুল লতীফ (৭৫) ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে গত ২৮শে মে শুক্রবার দিবাগত রাত ৮.৪৫ মিনিটে নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন)*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনী সহ বহু গুণগ্রাহী রেখে যান। পরদিন সকাল ৯-টায় অনুষ্ঠিত তার জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল হোসাইন। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

(৬) 'আন্দোলন' মাগুরা যেলার সভাপতি মাওলানা ওয়াহীদুয্যামানের পিতা মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল হাই (৮৫) গ্যাস্ট্রিক সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে গত ৩রা জুন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭-টায় নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন)*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র এবং নাতি-নাতনী সহ বহু গুণগ্রাহী রেখে যান। পরদিন সকাল ১১-টায় নিজ বাড়ীর আঙ্গিনায় তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন তার কনিষ্ঠ পুত্র ও মাগুরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ওয়াহীদুয্যামান। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর নেতৃবৃন্দসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। উল্লেখ্য, মাওলানা আব্দুল হাই শেষ বয়সে ছহীহ আক্বীদা গ্রহণ করেন এবং যেলা 'আন্দোলন'কে নানাভাবে সহযোগিতা করেন।

(৭) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরবের আল-খাবজী ছানাইয়া শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয সাইফুল ইসলাম রেযা (৩৪) গত ৯ই জুন বুধবার দুপুর ১১-টা ৫৫ মিনিটে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন)*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে যান। অতঃপর প্রশাসনিক জটিলতা শেষে ১৪ই জুন সোমবার বাদ আছর আল-খাবজীর ইমাম বুখারী মসজিদে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' আল-খাবজী শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ তোফাযযল হোসাইন, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শামীম, যুববিষয়ক সম্পাদক মাওলানা আব্দুল্লাহসহ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরবের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। জানাযা শেষে তাকে আল-খাবজী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য, হাফেয সাইফুল ইসলামের বাড়ী বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া যেলার নাসিরনগর উপযেলার ভুবন গ্রামে। সঊদী আরবে অবস্থিত আল-খাবজীর এক মসজিদে ইমাম হিসাবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অবসর সময়ে তিনি গাড়ী চালাতেন। কিছুদিন আগে তিনি ওমরাহ করানোর জন্য মা, বোন ও ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে সঊদীতে নিয়ে যান। বৃহস্পতিবার তাদের ওমরাহ পালনের দিন নির্ধারিত ছিল। সঊদী আরবের দাম্মাম থেকে গাড়ী চালিয়ে তিনি বাসায় যাচ্ছিলেন তাদের ওমরাহ পালনের জন্য নিয়ে যেতে। পথিমধ্যে দাম্মাম ও আল-খাবজীর মাঝামাঝি এলাকায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। ফলে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীতে আগুন ধরে যায়। পরে পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

[আমরা সকল মাইয়েতের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাদের শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২১

নীতিমালা

ক- গ্রুপ : বয়স : ৭ থেকে ১০ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২১ সালের ৮ই অক্টোবর সর্বোচ্চ ১০ বছরের মধ্যে থাকতে হবে। **নিম্নের ৪টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।**
বিষয়গুলির ১, ২ ও ৩ নং মৌখিকভাবে এবং ৪ নং এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. আক্বীদা (আবশ্যিক ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত) : প্রশ্নোত্তর (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।
২. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।
(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ফাতিহা ও ইখলাছ। **(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।
৩. দো'আ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।
৪. সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-১ সম্পূর্ণ বই (যাদু নয় বিজ্ঞান ও শব্দ অনুসন্ধান বাদে)।

খ- গ্রুপ : বয়স : ১০+ থেকে ১৩ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২১ সালের ৮ই অক্টোবর সর্বোচ্চ ১৩ বছরের মধ্যে থাকতে হবে। **নিম্নের ৫টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।**
বিষয়গুলির ১, ২, ৩ ও ৪ নং মৌখিকভাবে এবং ৫ নং এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

১. আক্বীদা (আবশ্যিক সম্পূর্ণ) : প্রশ্নোত্তর (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।
২. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ : (২৪ ও ২৫ তম পারা)।
৩. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।
(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা কাহফ ১০৭-১১০ আয়াত। **(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১৫টি হাদীছ)।
৪. সোনামণি জাগরণী : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী।
৫. সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (সম্পূর্ণ ৬-১৯ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ ২০-৪৬ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ, প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, শিশু অধিকার ও ভাষা ৬৩-৭৫ পৃ.) সংগঠন বিষয়ক (৯৪-৯৮ পৃ.) এবং বুদ্ধিমত্তা ইংরেজী (৯৯ পৃ.)।

❖ পরিচালকগণের জন্য

গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা প্রতিযোগিতা : (এমসিকিউ পদ্ধতিতে) (ক) সোনামণি গঠনতন্ত্র (সম্পূর্ণ বই)।
(খ) সোনামণি প্রতিভা-এর ১. সম্পাদকীয় : অনুসরণ করব কাকে?, ৪৩তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, '২০; জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ, ৪৫তম সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, '২১; সময়ের সদ্ব্যবহার, ৪৬তম সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল '২১।
২. প্রবন্ধ : শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা, ৪২-৪৭তম সংখ্যা।

◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।
২. ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (৩য় সংস্করণ) ও **জ্ঞানকোষ-২** (২য় সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে।
৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।
৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।
৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।
৭. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সোনামণিদের বয়স সর্বোচ্চ ১৩ বছর হবে।
৮. প্রতিযোগীকে পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' এবং জন্ম নিবন্ধন-এর ফটোকপি অপর পৃষ্ঠায় অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।
৯. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
১০. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১১. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।
১২. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
১৩. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।
১৪. **গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা** প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালকগণ'** সরাসরি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগহণ করবেন এবং প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
১৫. কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে যেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল অবশ্যই কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা	**: ৮ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
২. উপযেলা	**: ১৫ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৩. যেলা	**: ২২শে অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়	**: ১১ই নভেম্বর**	**(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।**

উল্লেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩৬১) : অন্যের জমিতে ফসলের ক্ষতি না করে বিনা অনুমতিতে গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী চরানো বা ঘাস খাওয়ানো যাবে কি?

-নাঈম, জাফলং, সিলেট।

উত্তর : জমির মালিকের সাধারণ অনুমতি থাকলে কিংবা এলাকায় প্রচলন থাকলে ঘাস খাওয়ানো বা চরানোয় কোন বাধা নেই। আর জমির নির্দিষ্ট মালিক না থাকলে বা সরকারী খাস জমি যেমন রাস্তার দু'পাশ বা নদীর পাড়সমূহে পশু চরানোতে কোন দোষ নেই *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১/৪১৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তিন প্রকার জিনিসে সকল মুসলিম অংশীদার; আর তা হ'ল- পানি, ঘাস ও আগুন *(ইবনু মাজাহ হা/২৪৭৩; মিশকাত হা/৩০০১; ইরওয়া হা/১৫৫২-এর আলোচনা)*। তিনি আরও বলেন, অতিরিক্ত ঘাসে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত পানি রোধ করে রাখবে না *(বুখারী হা/২৩৫৪; মিশকাত হা/২৯৯৪)*।

প্রশ্ন (২/৩৬২) : অমুসলিম ব্যক্তি সারা জীবন আর্ত-মানবতায় সেবা সহ নানা জনহিতকর কাজ করে মৃত্যুবরণ করলে তার আখেরাতে মুক্তি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে কি?

-ইব্রাহীম হোসাইন, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : কাফের বা অমুসলিম দুনিয়াতে কোন সৎকর্ম করলে এর প্রতিদান দুনিয়াতেই পাবে, পরকালে নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাসী হয়েছে এবং অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের কারু কাছ থেকে যমীন ভর্তি স্বর্ণও গ্রহণ করা হবে না, যদি তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তির বিনিময়ে তা দিতে চায়। ওদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এবং ওদের কোন সাহায্যকারী নেই' *(আলে ইমরান ৩/৯১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কাফের যদি দুনিয়াতে কোন সৎকর্ম করে তবে এর প্রতিদান স্বরূপ দুনিয়াতেই তাকে জীবনোপকরণ প্রদান করা হয়ে থাকে। আর মুমিনদের নেকী আল্লাহ তা'আলা আখেরাতের জন্য জমা রাখেন এবং আনুগত্যের পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবীতেও জীবিকা প্রদান করে থাকেন' *(মুসলিম হা/২৮০৮)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, জাহেলী যুগে আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আন বড় অতিথিবৎসল ছিল। সে মযলূমকে সাহায্য করত এবং অভুক্তকে খাদ্য দান করত। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! ঐ ব্যক্তির সৎকর্ম তার পরকালে কোন ফায়েদা দিবে কি? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, না। কেননা ঐ ব্যক্তি একদিনের জন্যেও বলেনি, 'হে আমার পালনকর্তা! শেষ বিচারের দিন তুমি আমার গোনাহ সমূহ ক্ষমা কর' *(মুসলিম হা/২১৪)*। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কাফের যখন মুসলিম হয়, তখন তার জাহেলী যুগের সৎকর্ম তার উপকারে আসে। কিন্তু যদি কুফরী হালতে মৃত্যুবরণ করে, তাহ'লে সেগুলি তার কোন কাজে আসে না। বরং কুফরীর কারণে সবই বিফলে যায় *(ছহীহাহ হা/২৪৯-এর আলোচনা)*। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন কাফেরকে হাযির করে বলা হবে, যদি তোমার কাছে যমীন ভর্তি স্বর্ণ থাকে, তবে তুমি কি তার বিনিময়ে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি কামনা করবে? সে বলবে, হ্যাঁ। তখন তাকে বলা হবে, হ্যাঁ, তার চাইতে খুব সহজ বস্তু তোমার কাছে চাওয়া হয়েছিল (তথা ঈমান)। কিন্তু তুমি তা গ্রহণ করনি *(বুখারী হা/৬৫৩৮; মুসলিম হা/২৮০৫)*। অতএব অমুসলিম ব্যক্তির সৎকর্ম পরকালে কোন কাজে আসবে না।

প্রশ্ন (৩/৩৬৩) : আমাদের মসজিদে কাতারের মধ্যে পিলার আছে। এমতাবস্থায় পিলার সহ কাতার করা যাবে কি? বিশেষত বাধ্যগত অবস্থায় কাতার করলে ছালাত হবে কি?

-শিহাবুদ্দীন, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : সাধারণ অবস্থায় পিলারসহ কাতার করা যাবে না। কুর্রা (রাঃ) বলেন, আমাদেরকে খুঁটি সমূহের মধ্যবর্তী জায়গায় ছালাত পড়তে নিষেধ করা হ'ত। এমনকি সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়া হ'ত' *(ইবনু মাজাহ হা/১০০২; ছহীহাহ হা/৩৩৫; তামামুল মিন্নাহ ২৯৬ পৃ.)*। তবে লোক সমাগম বেশী হওয়ার কারণে স্থান সংকুলান না হ'লে বাধ্যগত অবস্থায় দাঁড়ানো জায়েয *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/২৯৫; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/৩৪)*। আব্দুল্লাহ হামীদ ইবনু মাহমূদ (রহঃ) বলেন, আমরা আনাস (রাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা জনৈক আমীরের সঙ্গে ছালাত আদায় করছিলাম। তারা আমাদের পেছনে সরিয়ে দিল। তারপর আমরা দুই স্তম্ভের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করলাম। আনাস (রাঃ) পিছিয়ে যেতে থাকলেন এবং বললেন, রাসূল (ছাঃ)-এর সময়ে আমরা এটা (দুই স্তম্ভের মধ্যে দাঁড়ানো) পরিহার করতাম *(আবুদাউদ হা/৬৭৩; তিরমিযী হা/২২৯; আহমাদ হা/১২৩৬১, সনদ ছহীহ)*। উল্লেখ্য, পিলারের মাঝে কেউ একাকী ছালাত আদায় করলে অথবা ইমাম একা দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করলে কোন দোষ নেই *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/২২০ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৪/৩৬৪) : রামাযানে ছিয়াম রাখতে না পারলে সারা মাসের ছিয়ামের ফিদ্‌ইয়াস্বরূপ হোটেলে এক বেলা ৩০ জন মিসকীনকে খাইয়ে দিলে যথেষ্ট হবে কি? ফিদ্‌ইয়া কি রামাযানের মধ্যে না রামাযানের পর আদায় করলেও চলবে?

-রহমত, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : অতিবৃদ্ধ, গর্ভবতী, দুগ্ধদায়িনী মা বা চিররোগী ব্যক্তি ফিদ্‌ইয়া হিসাবে দৈনিক সিকি ছা' (৬২৫ গ্রাম) চাউল বা গম মিসকীনকে প্রদান করবে। অথবা একদিনে ৩০ জন মিসকীনকে খাওয়াবে। চাই সেটা বাড়িতে খাবার বানিয়ে হৌক বা হোটেলে হৌক। আনাস (রাঃ) বার্ধক্যজনিত কারণে ছিয়াম রাখতে না পারলে রামাযানের শেষ দিনে ত্রিশ জন মিসকীনকে গোশত-রুটি খাইয়েছিলেন *(ইবনু কাছীর, তাফসীর*

বাক্বারাহ ১৮৪ আয়াত)। এই ফিদইয়া রামাযান মাসের মধ্যে আদায় করা মুস্তাহাব। তবে সঙ্গত কারণে পরে দেওয়াতেও কোন বাধা নেই। অতএব কেউ রামাযানের পরে আদায় করলেও জায়েয হবে *(যাকারিয়া আনছারী, আসনাল মাত্বালিব ১/৪৩০)*। ফিদইয়া বেশী দেওয়াতেও কোন বাধা নেই। বরং উত্তম। আল্লাহ বলেন, 'যদি কেউ স্বেচ্ছায় বেশী দেয়, তবে সেটা তার জন্য উত্তম হবে' *(বাক্বারাহ ১৮৪)*।

প্রশ্ন (৫/৩৬৫) : বিবাহে স্বর্ণ উপহার দিলে পুরুষের জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ হবে কি?

-মুরাদুযযামান, ফুলকোচা, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : বিবাহের কেউ স্বর্ণ উপহার দিলে তা গ্রহণ করা যাবে। তবে নিজে ব্যবহার না করে স্ত্রীসহ যেকোন মহিলা আত্মীয়কে হাদিয়া প্রদান করবে বা বিক্রয় করে দিবে। রাসূল (ছাঃ)-কে রেশমের পোষাক উপহার দেওয়া হ'লে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং অন্যকে হাদিয়া দিয়ে দেন *(বুখারী হা/২১০৪; মুসলিম হা/২০৬৮)*।

প্রশ্ন (৬/৩৬৬) : ঘুমানোর সকল দো'আ পাঠ করি। তারপরেও রাতে একাকী ঘুমালে আমার উপর জিন ভর করে চেপে ধরে। এদিকে আমার বিবাহের জন্য বহু প্রচেষ্টা চললেও বারবার তা ভেঙ্গে যায়। এজন্য কেউ কেউ জিন লাগার কথা বলছে। এসব থেকে পরিত্রাণের উপায় কি?

-নাসরীন আখতার, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : দো'আ পাঠে অবহেলার কারণে অথবা মানসিক কারণে এমনটি হ'তে পারে। তবে কেউ জাদু-টোনা করে থাকলে তা নষ্ট করে দিতে হবে। রাসূল (ছাঃ)-কে যাদু করা হ'লে ততক্ষণ তিনি সুস্থ হ'তে পারেননি, যতক্ষণ না জাদুকৃত বস্তু দূর করা হয় *(বুখারী হা/৩২৬৮; মুসলিম হা/২১৮৯)*। এর পর নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত শেষে সূরা নাস, ফালাক্ব, ইখলাছ ও আয়াতুল কুরসী একবার করে পাঠ করবে এবং মাগরিব ও ফজর ছালাত শেষে নিয়মিত তিনবার করে পাঠ করবেন *(আবুদাউদ হা/৫০৮২; মিশকাত হা/২১৬৩, ৯৬৯; ছহীহুত তারগীব হা/৬৪৯)*। পাশাপাশি ঘুমানোর পূর্বে ওযূ করে বিছানায় তিনবার করে নাস, ফালাক্ব ইখলাছ পাঠ করে সারা শরীরে হাত বুলাবেন *(বুখারী হা/৬৩১৯)*। অতঃপর আয়াতুল কুরসী পাঠ করে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করার পর ঘুমাবেন *(আহমাদ হা/২৬৫৯৩; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৭০৩৭)*। ইনশাআল্লাহ জিন বা শয়তান কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর বিবাহের ব্যাপারটি ভাগ্যের বিষয়। বেশী বেশী ছালাতুল হাজত আদায় করে এ ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য কামনা করুন।

প্রশ্ন (৭/৩৬৭) : ইবনু ছাইয়াদকে রাসূল (ছাঃ) দাজ্জাল বলে সন্দেহ করার কারণ কি? তাহ'লে দাজ্জাল কি পূর্ব থেকেই জীবিত না কি শেষ যামানায় জন্ম লাভ করবে?

-আরিফ খান, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

উত্তর : দাজ্জাল পূর্ব থেকেই জীবিত রয়েছে এবং বিখ্যাত ছাহাবী তামীম দারী (রাঃ) ও তার ত্রিশজন সাথী সাগরে পথ হারিয়ে এক দ্বীপে গিয়ে ওঠেন। সেখানে পানির খোঁজে বের হ'লে একজন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়। যে তার চুল টেনে নিয়ে চলছিল। অতঃপর তিনি দাজ্জালের কাহিনী বর্ণনা করেন। যেখানে দাজ্জালের বক্তব্য এসেছে এভাবে যে, যদি আমাকে এখান থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহ'লে আমি পুরা পৃথিবী ধ্বংস করে দেব মদীনা ব্যতীত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লোকদের মাঝে নিয়ে এলেন এবং সে তাদেরকে পূর্ণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করে শুনাল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এ শহরটি হ'ল ত্বাইবাহ (মদীনা)। আর সে হ'ল দাজ্জাল' *(মুসলিম হা/২৯৪২ (১২১)*। অন্য বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেন, দাজ্জাল শেষ যামানায় খোরাসান থেকে বের হবে' *(তিরমিযী হা/২২৩৭; ইবনু মাজাহ হা/৪০৭২)*।

অপর বর্ণনায় ফাতেমা বিনতে ক্বায়েস (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন, একদিন রাসূল (ছাঃ) এশার ছালাতে দেরীতে এলেন ও বললেন, তামীম দারী আমাকে এমন কিছু ঘটনা বলেছে, যা আমাকে আটকে রেখেছিল। সে বলল, সাগরের কোন এক দ্বীপে তার সাথে এক নারীর সাক্ষাৎ হয়। যার মাথার চুল এত লম্বা যে, তা যমীনে হিঁচড়িয়ে চলে। তামীম দারী তাকে বলল, তুমি কে? সে বলল, আমি গুপ্তচর। অতঃপর সে বলল, ঐ প্রাসাদে প্রবেশ করুন। তখন আমি সেখানে গেলাম ও লোহার শিকলে বাঁধা লম্বা চুলবিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে দেখলাম। সে আসমান যমীনের মাঝখানে ছটফট করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে? সে বলল, আমি দাজ্জাল। সে বলল, নিরক্ষরদের নবীর আবির্ভাব ঘটেছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, লোকেরা তাঁকে মান্য করছে নাকি অমান্য করছে? আমি বললাম, মান্য করছে। সে বলল, এটাই তাদের জন্য কল্যাণকর' *(আবুদাঊদ হা/৪৩২৫; মিশকাত হা/৫৪৮৪)*।

উক্ত হাদীছদ্বয়ে বুঝা যায় যে, দাজ্জাল পূর্ব থেকেই জীবিত রয়েছে এবং শেষ যামানায় ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে বের হবে। এক্ষণে ইবনু ছাইয়াদকে দাজ্জাল হিসাবে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের সন্দেহের কারণ হ'ল, রাসূল (ছাঃ)-কে দাজ্জালের আগমনের সময় সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি। সেকারণ তাঁর ও ছাহাবীগণের মনে সন্দেহ ছিল। তবে এই সন্দেহ দূর হয়ে যায় যখন ইবনু ছাইয়াদ হজ্জ সম্পাদন করে। যেমন হাদীছে এসেছে যে, হজ্জের সফরে ইবনু ছাইয়াদ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-কে আপ্যায়ন করতে চাইলে তিনি অনীহা প্রকাশ করেন। এই অবস্থা দেখে ইবনু ছাইয়াদ বলল, হে আবু সাঈদ! লোকেরা আমার ব্যাপারে যেসব কথা বলে তাতে আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি একটি রশি নিয়ে সেটা গাছে লটকিয়ে ফাঁসি দিয়ে মরে যাই এবং এ থেকে পরিত্রাণ পাই। তারপর সে বলল, হে আবু সাঈদ! তোমাদের আনছারদের নিকট রাসূল (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ গোপন নেই। তুমি কি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী জ্ঞাত নও? রাসূল (ছাঃ) কি বলেননি যে, সে ব্যক্তি (দাজ্জাল) কাফির হবে? অথচ আমি মুসলিম। তিনি কি বলেননি যে, দাজ্জাল নিঃসন্তান হবে। অথচ মদীনায় আমি আমার সন্তান রেখে এসেছি। রাসূল (ছাঃ) কি বলেননি যে, দাজ্জাল মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। অথচ আমি মদীনা থেকে এসেছি। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, তার কথায় আমি তাকে বিশ্বাস করার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম। অতঃপর

ইবনু ছাইয়াদ বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি তাকে (দাজ্জালকে) চিনি, তার জন্মস্থান চিনি এবং এখন সে কোথায় আছে, তাও আমি জানি। এ কথা শুনে আমি বললাম, তোমার সারাটা দিন ধ্বংস হোক' *(মুসলিম হা/২৯২৭ (৯১)*।

উক্ত হাদীছের শেষাংশে ইবনু ছাইয়াদ সন্দেহের তীর ছুঁড়েছে। সেজন্য হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) এই সংক্রান্ত হাদীছগুলির সমন্বয় করে বলেন, তামীম দারী (রাঃ) যে দাজ্জালকে দেখে এসেছেন সে-ই প্রকৃত দাজ্জাল। আর শয়তান ইবনু ছাইয়াদের রূপ ধারণ করে দাজ্জালী কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে রাসূল (ছাঃ) সহ ছাহাবায়ে কেরামকে সন্দেহে নিক্ষেপ করেতে চেয়েছিল। সেজন্য সে হাররার দিন ইছফাহানের দিকে রওয়ানা দিয়ে হারিয়ে যায়। যাকে পরবর্তীতে কোথাও দেখা যায়নি *(ফাৎহুল বারী ১৩/৩৮০)*। 'হাররার দিন' অর্থ ইয়াযীদের সেনাবাহিনী কর্তৃক মদীনা অবরোধের দিন।

উল্লেখ্য যে, বর্তমান যুগে কোন কোন ব্যক্তি বা দল ইহূদী-খৃষ্টান জগৎ, এমনকি যালেম শাসক, অনৈসলামী মিডিয়া প্রভৃতিকে 'দাজ্জাল' আখ্যায়িত করে থাকে। ইসলামী শরী'আতে যার কোন ভিত্তি নেই।

প্রশ্ন (৮/৩৬৮) : রামাযান মাসে বা জুম'আর দিনে মৃত্যুবরণ করলে এর বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

-নাহিদ হাসান, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন মুসলমান যদি জুম'আর দিনে বা রাতে মারা যায়, আল্লাহ তাকে কবরের ফিৎনা হ'তে রক্ষা করেন' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৫৭৭৩)*। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ দিনের বরকতে মুমিন ব্যক্তিদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে কবরের ফিৎনা তথা আযাব থেকে রক্ষা করবেন ইনশাআল্লাহ *(মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৪৪০)*। উক্ত হাদীছটি শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে 'হাসান' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তবে শায়খ শু'আইব আরনাঊত্ব ও হুসাইন সালীম আসাদ বলেন, হাদীছটির শাহেদ থাকলেও সেগুলো এমন শক্তিশালী নয়, যা হাদীছের সনদকে ছহীহ বা হাসানের পর্যায়ে উন্নীত করবে। অতএব হাদীছটি যঈফ *(তাহকীক মুসনাদে আহমাদ হা/৬৫৮২; তাহকীক মুসনাদে আবু ইয়া'লা হা/৪১১৩)*। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীছ সমূহকে যঈফ বলেছেন *(ফাৎহুল বারী ৩/১৯৬, ২৫৩)*। এছাড়া কোন ছাহাবী শুক্রবারে মৃত্যুর জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন বলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং আবুবকর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর দিন তথা সোমবারে মৃত্যুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করেছেন *(বুখারী হা/১৩৮৭)*। মোদ্দাকথা এরূপ গায়েবের বিষয় ত্রুটিপূর্ণ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত না করাই উত্তম হবে। অনুরূপভাবে রামাযানে মারা গেলে বিশেষ কোন মর্যাদার ব্যাপারে কোন দলীল নেই। তবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির আশায় যেকোন মাসে ছিয়ামরত অবস্থায় মারা গেলে রাসূল (ছাঃ) তাকে জান্নাতী বলে আখ্যায়িত করেছেন *(আহমাদ হা/২৩৩৭২; ছহীহুত তারগীব হা/৯৮৫)*।

প্রশ্ন (৯/৩৬৯) : ওযূ করার সময় ক্বিবলামুখী হওয়া ওয়াজিব কি? এছাড়া ওযূ করার সময় প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার দো'আ আছে কি?

-এম. এস. আলম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

উত্তর : ওযূ করার সময় ক্বিবলামুখী হওয়াকে অধিকাংশ বিদ্বান মুস্তাহাব বলেছেন *(নববী, আল-মাজমূ' ১/৪৬৫; হাশিয়াতু ইবনু আবেদীন ১/১২৫; ইবনুল মুফলেহ, আল-ফুরূ' ১/১৫২)*। কিন্তু মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে কোন দলীল পাওয়া যায় না। সুতরাং মুছল্লী যে দিকে মুখ করে ওযূ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে সেদিকে মুখ করে ওযূ করবে *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৭/২)*।

প্রশ্ন (১০/৩৭০) : আলেমদেরকে 'মাওলানা' বলা যাবে কী?

-আবুল বাশার, দিনাজপুর।

উত্তর : উপমহাদেশে সম্মানসূচক সম্বোধন হিসাবে 'মাওলানা' (আমাদের বন্ধু/অভিভাবক) বলা হয়ে থাকে *(ফীরোযুল লুগাত)*। 'মাওলানা' এমন একটি শব্দ যা আল্লাহ এবং বান্দা উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, দাস তার মালিককে যেন আমার মাওলা না বলে। কারণ তোমাদের সকলের মাওলা আল্লাহ রব্বুল আলামীন *(মুসলিম হা/২২৪৯; মিশকাত হা/৪৭৬০)*। উক্ত হাদীছে মাওলা অর্থ প্রভু তথা আল্লাহকেই বুঝানো হয়েছে। সেজন্য উক্ত শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, আর গোলামও নিজের মনীবকে প্রভু বলবে না, বরং সে যেন 'আমার সর্দার' ও 'আমার মাওলা' বলে *(মুসলিম হা/২২৪৯; মিশকাত হা/৪৭৬০)*। ছাহাবীগণ তাদের মনিবদের ক্ষেত্রে 'মাওলা' শব্দ ব্যবহার করেছেন *(মুসলিম হা/১০২৫; মিশকাত হা/১৯৫৩)*। যা প্রমাণ করে যে, আলেম ও বিজ্ঞজনদের 'মাওলানা' বলে সম্বোধন করা যাবে *(নববী, আল-আযকার ৩৬২-৬৩, ৫৭৫; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১/১৯১; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/৯২৭)*।

প্রশ্ন (১১/৩৭১) : আমি পরিবহন সেক্টরে কাজ করি। আমার অধিকাংশ ছালাত সফর অবস্থায় হয়ে থাকে। সারাজীবন এভাবেই কি আমি ক্বছর ছালাত আদায় করতে পারব?

-সাঈদ হোসাইন, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : যারা দূরপাল্লার পরিবহনে কাজ করে, তাদের জন্য ছালাত ক্বছর করাতে শরী'আতে কোন বাধা নেই। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) আযারবাইজান সফরে গেলে পুরো বরফের মৌসুম সেখানে আটকে যান ও ছয় মাস যাবৎ ক্বছর করেন *(বায়হাক্বী ৩/১৫২ পৃঃ; ইরওয়া হা/৫৭৭, সনদ ছহীহ)*। অনুরূপভাবে হযরত আনাস (রাঃ) শাম বা সিরিয়া সফরে গিয়ে দু'বছর সেখানে থাকেন ও ক্বছর করেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৩-১৪ পৃঃ; মিরক্বাত ৩/২১১ পৃঃ)*। সুতরাং স্থায়ী মুসাফির যেমন জাহায, বিমান, ট্রেন, বাস ইত্যাদির চালক ও কর্মচারীগণ সফর অবস্থায় সর্বদা ছালাতে ক্বছর করতে পারেন *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৮৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১২/৩৭২) : স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে কাগজের টাকা ব্যবহার করা কি শরী'আত সম্মত?

-আবুল বাশার, মুজিবনগর, মেহেরপুর।

উত্তর : কাগজের টাকা স্বর্ণ বা রৌপ্যের মূল্যমান যা প্রথমে তাম্র মুদ্রা হিসাবে তাবেঈগণের যুগে চালু হয়ে পরবর্তীতে টাকার রূপ ধারণ করে অদ্যাবধি চলমান। উমাইয়া খলীফা

আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান (৬৫-৮৬ হি.) প্রথমবারের মত মুসলিম বিশ্বে আরবীতে লেখা দীনার (স্বর্ণমুদ্রা), দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) ও ফাল্স (তাম্র মুদ্রা) প্রচলন করেন। তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রার প্রচলন হয়। এভাবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্যমান ধরে অন্যান্য মুদ্রার প্রচলন ঘটে। ইমাম মালেক (রহঃ)-কে ফাল্স বা তাম্রমুদ্রার সূদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি একে স্বর্ণ বা রৌপ্যের সাথে তুলনা করে সূদ হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করেন *(আল-মুদাউওয়ানাহ ৩/৫, ৩/২৯)*। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ ও তার ছাত্র ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) স্বর্ণ ও রৌপ্যে সূদের বিষয়টি এর মূল্যমানের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন, ওযনের সাথে নয়। তারা মূল্যমানের সাথে সমন্বয় করাকে বিশুদ্ধ বলেছেন *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৯/৪৭১-৭২; ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/১৫৬)*।

উপরোক্ত আলোচনা প্রমাণ করে যে, কাগজের টাকা স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্যমান হিসাবে ব্যবহার করা জায়েয। শায়েখ বিন বায (রহঃ) বলেন, কাগজের টাকা একটি আরেকটির বিনিময়ে ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বর্ণের ও রৌপ্যের স্থলাভিষিক্ত *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/১৫৮)*। এছাড়া রাবেতায়ে 'আলমে ইসলামী ও হাইআতু কিবারিল ওলামা তথা সঊদী আরবের 'সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ' এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, কাগজের টাকা স্বর্ণ ও রৌপ্যের স্থলাভিষিক্ত, যা ব্যবহার করা জায়েয।

বস্তুতঃ কাগজের নোটই বর্তমানে মূল্য হিসাবে প্রচলিত এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বর্ণ ও রৌপ্যের স্থলাভিষিক্ত। এর উপরেই সকল প্রকার লেনদেন চলমান। নিছক কাগজ হিসেবে এর কোন মূল্য নেই। কিন্তু এটি বাণিজ্য ও লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আর এটিই এর মূল্যের রহস্য।

দ্বিতীয়তঃ সোনা-রূপা ও অন্যান্য মুদ্রার মত কাগজের নোটও স্বতন্ত্র মুদ্রা হিসাবে গণ্য। আবার দেশ ও অঞ্চলের ভিন্নতার কারণে কাগজের নোটও মানগতভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। অর্থাৎ সঊদী রিয়ালের মান আর আমেরিকান ডলারের মান এক নয়। এভাবে প্রত্যেক দেশের কাগজী নোট স্বতন্ত্র মুদ্রা হিসাবে গণ্য। সে অনুযায়ী সোনা-রূপা ও অন্যান্য মূল্যের মতো কাগজের মুদ্রা বা নোটের উপরও সূদের বিধান কার্যকর হবে। মোটকথা কাগজের মুদ্রা স্বর্ণ বা রৌপ্যের স্থলাভিষিক্ত, যা ব্যবহারে শরী'আতে কোন বাধা নেই *(আবহাছু হাইআতি কিবারিল ওলামা ১/৮৫)*।

প্রশ্ন (১৩/৩৭৩) : ছালাতে ক্বিবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ করার ব্যাপারে শারঈ কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

-আহমাদ, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : ছালাতরত অবস্থায় ক্বিবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ করা সিদ্ধ নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ক্বিবলার দিকে থুথু ফেলে ক্বিয়ামতের দিন তার ঐ থুথু দু'চোখের মধ্যখানে পতিত অবস্থায় উপস্থিত হবে' *(আবুদাউদ হা/৩৮২৪; ছহীহাহ হা/২২২)*। তিনি আরো বলেন, ক্বিবলার দিকে যে কফ ফেলে তার চেহারায় ঐ কফ থাকা অবস্থায় সে ব্যক্তিকে ক্বিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত করা হবে *(ইবনু খুযায়মাহ হা/১৩১৩; ছহীহাহ হা/২২৩)*। তিনি আরো বলেন, মসজিদে থুথু নিক্ষেপ করা গুনাহ ও তা দাফন করা ছওয়াবের কাজ *(ছহীহুত তারগীব হা/২৮৭)*। ছালাতের মধ্যে থুথু বা কফ ফেলার আদব সম্পর্কে হাদীছে বলা হয়েছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, (একবার) রাসূল (ছাঃ) মসজিদে ক্বিবলার দিকে শ্লেষ্মা দেখতে পেলেন। অতঃপর লোকদের দিকে ফিরে বললেন, তোমাদের কি হয়েছে? তোমাদের একজন তো প্রভুর দিকে মুখ করে ছালাতে দাঁড়ায়, তারপর সে সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ করতে থাকে। তোমাদের কেউ কি এটা পসন্দ করবে যে, কেউ তার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে অতঃপর তার মুখের উপর থুথু নিক্ষেপ করবে? যখন তোমাদের কারো থুথু এসে পড়ে, তখন বামদিকে পায়ের নিচে ফেলবে। যদি জায়গা না থাকে, তবে এরূপ করবে। রাবী কাসেম এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নিজ কাপড়ে থুথু ফেললেন এবং এক প্রান্তকে আরেক প্রান্ত দিয়ে ঘষে ফেললেন *(মুসলিম হা/৫৫০)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি সেখানে যাফরানের সুগন্ধি ছড়িয়ে দিলেন *(ছহীহুত তারগীব হা/২৮০)*।

জনৈক ইমাম মসজিদে ক্বিবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ করলে পরবর্তীতে রাসূল (ছাঃ) তাকে ইমামতি করতে দেননি *(আবুদাউদ হা/৪৮১; মিশকাত হা/৭৪৭; ছহীহুত তারগীব হা/২৮৮)*।

প্রশ্ন (১৪/৩৭৪) : নারীদের জন্য নকশাযুক্ত সুন্দর রংয়ের বোরকা ও স্কার্ফ পরিধান করা শরী'আতসম্মত কি?

-তাহেরা, নওদাপাড়া, রাজশাহী

উত্তর : সাধারণ নকশাদার কাপড় পরিধান করা নারীদের জন্য নাজায়েয নয়। তবে এমন নকশাদার কাপড় পরিধান করা যাবে না, যা পরপুরুষদের নযর কাড়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর তারা যে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তবে যেটুকু স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় সেটুকু ব্যতীত *(নূর ২৪/৩১)*। সুতরাং নারীদের জন্য এমন কাপড় পরিধান করে বাইরে বের হওয়া জায়েয নয়, যা পর্দার মূল উদ্দেশ্য বিরোধী *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৭/১০০)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৭৫) : ছালাতরত অবস্থায় কোন কারণে ছালাতের স্থান থেকে ডানে-বামে সরে যাওয়া যাবে কি?

-মাহমূদ, মানিকগঞ্জ।

উত্তর : কাতার সোজা করা, কাতারের শূন্যস্থান পূরণ করা বা ডান বাম থেকে কোন মুছল্লী সরে যাওয়ার কারণে ফাঁকা স্থান পূরণ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে ডানে বা বামে সরে যাওয়া মুস্তাহাব *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৫০৩)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) ছালাতে রাসূল (ছাঃ)-এর বামে দাঁড়ালে তিনি তার মাথা ধরে তাঁর ডানে দাঁড় করান *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১১৯৫)*। অনুরূপভাবে প্রয়োজনে স্বল্পপরিসরে নড়াচড়া করা মুবাহ। যেমন মসজিদে ছালাত আদায়ের সময় রাসূল (ছাঃ) ছালাতে তার নাতনী উমামা বিনতে যয়নবকে কোলে ও পিঠে নিয়ে ছালাত আদায় করেছিলেন *(বুখারী হা/৫১৬; মুসলিম হা/৫৪৩)*। অতএব ছালাতের জন্য পরিপুরক কোন কাজে ডানে বা বামে সরে যাওয়ায় বাধা নেই।

প্রশ্ন (১৬/৩৭৬) : ছিয়াম শেষে ইফতারের সময় আমরা পুরো পরিবার একত্রিত হই এবং জামা'আতবদ্ধভাবে হাত তুলে

মুনাজাত করি। আমার দাদু দো'আ পড়েন। আর আমরা আমীন বলি। এরূপ করা জায়েয কি?

-মুহাম্মাদ হোসাইন, সুলতানপুর, নওগাঁ।

উত্তর : ইফতারের পূর্বে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করার কোন দলীল পাওয়া যায় না। নির্দিষ্টভাবে ইফতারের সময় দো'আ কবুল হয় মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৩; মিশকাত হা/২২৪৯; যঈফুল জামে' হা/১৯৬৫)*। তবে ছিয়াম পালনকারীর দো'আ কবুল করা হয় মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ *(ইবনু মাজাহ হা/১৭৫২)*। এমনকি মুসলমানের দো'আ দিন-রাত সর্বাবস্থায় কবুল হয় *(ছহীহুত তারগীব হা/১০০২)*। সুতরাং বিশেষভাবে ইফতারের সময় নয়, বরং ছিয়াম অবস্থায় যেকোন সময় দো'আ করার বিষয়টিই প্রমাণিত।

প্রশ্ন (১৭/৩৭৭) : জনৈক ব্যক্তি আমাকে একটি চাকুরীর জন্য সহযোগিতা করেছেন। তাকে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু উপহার হিসাবে দেই। এটা কি ঘুষ হবে?

-আবুল হাসান, জয়পুরহাট।

উত্তর : এটা ঘুষ হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সুফারিশ করার দরুণ যে ব্যক্তি সুফারিশকারীকে উপহার দেয় এবং (তার থেকে) সে ঐ উপহার গ্রহণ করে তাহ'লে সে ব্যক্তি সূদের দ্বারসমূহের মধ্য থেকে একটি বৃহৎ দ্বারে উপনীত হবে *(আবুদাঊদ হা/৩৫৪১; ছহীহাহ হা/৩৪৬৫)*। তবে কাউকে চাকুরী পেতে সহায়তা করলে সে অশেষ ছওয়াবের অংশীদার হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা সুফারিশ কর, বিনিময়ে তোমরা ছওয়াব পাবে *(বুখারী হা/১৪৩২)*। তিনি আরো বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের উপকার করতে সক্ষম, সে যেন তা করে *(মুসলিম হা/২১৯৯)*। আর সাধারণভাবে কেউ কাউকে কোন বিষয়ে সহযোগিতার জন্য শুকরিয়া স্বরূপ কিছু হাদিয়া প্রদান করা বা খাওয়ানো গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তাতে প্রার্থীর কামনা থাকা যাবে না *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৬/১৮০-১৮১)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৭৮) : ক্বিয়ামত পর্যন্ত একটি দল হকের উপর অটল থাকবে। কেউ তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না- এ হাদীছের ব্যাখ্যায় ছহীহ বুখারীতে এসেছে যে, এ দলটি কি সিরিয়ায় অবস্থান করবে? এক্ষণে নাজাতপ্রাপ্ত দলটি কেবল সিরিয়ার অধিবাসী হবে?

-আব্দুর রাক্বীব, সখের বাজার, নিলফামারী।

উত্তর : নাজাতপ্রাপ্ত দলটি কেবল শামের অধিবাসী বা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অধিবাসী হবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফাহ হা/৬৩৯০)*। উক্ত বর্ণনাগুলোকে ছহীহ ধরা হ'লেও নাজাতপ্রাপ্ত দলের শামে অবস্থান করাকে আবশ্যক করে না। বরং এই দলটি একেক সময় একেক স্থানে অবস্থান করবে। যেমন ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর আমলে হকপন্থী দলটি শামে অবস্থান করছিল। আবার আব্দুল ওয়াহহাব নাজদীর আমলে তারা সঊদী আরবে অবস্থান করছিল। আবার তারা একই সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থান করতে পারে। যেমন বিভিন্ন দেশের সালাফী মানহাজের লোকেরা *(হামূদ তুয়াইজেরী, ইত্তিহাফুল জামা'আত ১/৩৩২)*। কারণ বিভিন্ন হাদীছে হকপন্থী দলের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, পশ্চিম দেশীয়রা (আরববাসীরা/শামবাসীরা) বরাবর হকের উপর বিজয়ী থাকবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত *(মুসলিম হা/১৯২৫)*। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, বায়তুল মুক্বাদ্দাস বা শামে অবস্থান দ্বারা উদ্দেশ্য সে সকল লোক যারা দাজ্জাল দ্বারা অবরুদ্ধ হবে। অতঃপর ঈসা (আঃ) অবতরণ করে দাজ্জালকে হত্যা করবেন *(ফাৎহুল বারী ১৩/২৯৪-৯৫)*। অতএব নাজাতপ্রাপ্ত দলের সীমানা শাম বা সিরিয়ায় সীমাবদ্ধ নয়। বরং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকবে।

প্রশ্ন (১৯/৩৭৯) : অবাধ্য সন্তানদের মীরাছের ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কী?

-নূর নাহার বেগম, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : পিতা-মাতার অবাধ্য হ'লে ছেলে-মেয়ে কবীরা গোনাহগার হয়। কিন্তু মীরাছ হ'তে বঞ্চিত হয় না। কারণ মীরাছ হয় বংশীয় কারণে, সদাচরণের জন্য নয় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৫/২৮১)*। তাই সন্তানকে ত্যাজ্যপুত্র করা বা সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা নিষিদ্ধ। বরং পিতা-মাতা একাজ করলে সন্তানের হক নষ্ট করা হবে, যা পরকালে নিজের নেকী থেকে তাকে পরিশোধ করতে হবে *(মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭)*। তবে সন্তান 'মুরতাদ' হ'লে কিংবা অন্যায়ভাবে পিতা বা মাতাকে হত্যা করলে সে তাদের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে *(বুখারী হা/৬৭৬৪; মুসলিম হা/১৬১৪; মিশকাত হা/৩০৪৩; আবুদাঊদ হা/৪৫৬৪ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩৫০০)*। এক্ষেত্রে অবাধ্য ছেলে-মেয়েকে পিতা-মাতার কাছে এসে ক্ষমা চাইতে হবে এবং সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করতে হবে। কেননা পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি' *(তিরমিযী হা/১৮৯৯)* এবং মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত *(নাসাঈ হা/৩১০৪)*। এখানে উভয়পক্ষকে নমনীয় হ'তে হবে। কেননা 'রক্তসম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বুখারী হা/৫৯৮৪; মুসলিম হা/২৫৫৬; মিশকাত হা/৪৯২২)*।

প্রশ্ন (২০/৩৮০) : সূরা ত্বোয়াহা ১৩২ আয়াতের তাফসীর জানতে চাই।

-আল-আমীন, ভূগরইল, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত আয়াতের অনুবাদ- 'আর তুমি তোমার পরিবারকে ছালাতের আদেশ দাও এবং তুমি এর উপর অবিচল থাক। আমরা তোমার নিকট রূযী চাই না। আমরাই তোমাকে রূযী দিয়ে থাকি। আর (জান্নাতের) শুভ পরিণাম তো কেবল মুত্তাক্বীদের জন্যই' *(ত্বোয়াহা ২০/১৩২)*। এর তাফসীরে হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ যখন তুমি ছালাত আদায় করবে, তোমার নিকটে এমন স্থান থেকে রিযিক আসবে যা তুমি কল্পনাও করনি। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন। আর তাকে তিনি তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করবেন' *(তালাক ৬৫/২-৩)*। অর্থাৎ যদি কেউ আল্লাহ্র ইবাদত করে তাহ'লে আল্লাহ তাকে রিযিক প্রদান করবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদতের জন্য অবসর হও।

আমি তোমার হৃদয়কে স্বচ্ছলতা দ্বারা ভরে দেব এবং তোমার অভাব দূর করে দেব। আর যদি তুমি তা না কর, তাহ'লে আমি তোমার হাতকে ব্যস্ততা দিয়ে ভরে দেব এবং তোমার অভাব দূর করব না' *(ইবনু মাজাহ হা/৪১০৭; মিশকাত হা/২৪৬৬; ছহীহুত তারগীব হা/৩১৬৬)*। অতএব ইবাদতের সাথে রিযিকের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

প্রশ্ন (২১/৩৮১) : হাজারে আসওয়াদে মুখ রেখে ক্রন্দন করা সংক্রান্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-জালালুদ্দীন, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ *(ইরওয়াউল গালীল হা/১১১, ৪/৩০৮ পৃঃ)*। ইমাম নাসাঈ বলেন, হাদীছটি পরিত্যক্ত। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, হাদীছটি 'মুনকার' বা অগ্রহণযোগ্য *(ইরওয়া, ঐ)*। বরং স্পর্শ করত চুম্বন করা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী, মিশকাত হা/২৫৬৭)*।

প্রশ্ন (২২/৩৮২) : মি'রাজে গমনের সময় বায়তুল মুক্বাদ্দাসে সকল নবী-রাসূল কি সশরীরে উপস্থিত হয়েছিলেন? তারা কি কবর থেকে উত্থিত হয়েছিলেন? এ ব্যাপারে সবিস্তারে জানতে চাই।

-আল-মামুন, ভদ্রা, রাজশাহী।

উত্তর : মি'রাজ রজনীতে নবী-রাসূলগণ স্ব স্ব আকৃতিতে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ইমামতিতে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেছিলেন। সেকারণ রাসূল (ছাঃ) তাদের চিনতে পেরেছিলেন। তবে তারা কিভাবে এসেছেলেন সে বিষয়ে কিছু বর্ণিত হয়নি। এটি সম্পূর্ণ গায়েবী বিষয়। যার প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য। তবে ঈসা ও ইদ্রীস (আঃ)-এর বিষয়টি স্বতন্ত্র *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/৩২৮, ৫/৫২৬-২৭)*।

প্রশ্ন (২৩/৩৮৩) : দুই সিজদার মাঝে পঠিতব্য আল্লাহুম্মাগফিরলী.. দো'আটি ছহীহ কি? এটি ছাড়া এসময় পঠিতব্য আর কোন দো'আ আছে কি?

-আব্দুর রহমান, কুপতলা, গাইবান্ধা।

উত্তর : উক্ত দো'আটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(তিরমিযী হা/২৮৪; মিশকাত হা/৯০০)*। দুই সিজদার মাঝে প্রচলিত দো'আটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। যেমন কোন কোন হাদীছে কেবল 'রব্বিগ ফিরলী, রব্বিগ ফিরলী' (আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর) অংশটুকু এসেছে *(আবুদাউদ হা/৮৫০, ৮৭৪ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১২০০)*। অন্য হাদীছে এসেছে, আল্ল-হুম্মাগফিরলী ওয়ারহাম্নী ওয়াজ্বুরনী ওয়াহ্দিনী ওয়া 'আ-ফেনী ওয়ারঝুক্বনী (হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার উপরে রহম কর, আমার অবস্থার সংশোধন কর, আমাকে সুপথ প্রদর্শন কর, আমাকে সুস্থতা দান কর ও আমাকে রূযী দান কর') *(তিরমিযী হা/২৮৪ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৯০০)*। উক্ত হাদীছে ৬টি বিষয়ে প্রার্থনা এসেছে। কোন কোন হাদীছে এছাড়াও এসেছে, অরফা'নী (আমাকে উচ্চ সম্মানিত কর) *(ইবনু মাজাহ হা/৮৯৮)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৮৪) : জনৈক ব্যক্তি সবসময় মায়ের সেবা করে এসেছে এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মা তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু শেষ সময়ে মায়ের সাথে উচ্চবাক্য বিনিময় করায় তিনি কষ্ট পান এবং দু'দিন পরেই মারা যান। কিন্তু সন্তান তার নিকট থেকে মাফ নিতে পারেনি। এক্ষণে তার জন্য ক্ষমা পাওয়ার কোন সুযোগ আছে কি?

-রানু মিয়া, কুয়েত।*

*[*আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : পিতা-মাতা এমন দু'ব্যক্তি যাদেরকে উহ্ শব্দ দ্বারাও কষ্ট দেয়া যাবে না। এক্ষণে খারাপ আচরণের কারণে ক্ষমা নিতে না পারলে করণীয় হ'ল নিজে তওবা করা, মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ও তার জন্য দান করা ইত্যাদি। হাদীছে এসেছে, বনু সালিমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোন অবকাশ আছে কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, চারটি উপায় আছে। (১) তাদের জন্য দো'আ করা (২) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা (৩) তাদের প্রতিশ্রুতি সমূহ পূর্ণ করা এবং (৪) তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, যারা তাদের মাধ্যমে তোমার আত্মীয় (৫) তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা' *(আবুদাউদ হা/৫১৪২; মিশকাত হা/৪৯৩৬; ইবনু হিব্বান হা/৪১৮, ইবনু হিব্বান, হাকেম, যাহাবী, হুসাইন সুলাইম আসাদ এর সনদকে ছহীহ ও জাইয়েদ বলেছেন (হাকেম হা/৭২৬০; মাওয়ারিদুয যাম'আন হা/২০৩০। তবে শায়খ আলবানী ও শু'আইব আরনাউত্ব যঈফ বলেছেন। এর সনদ যঈফ হ'লেও মর্ম ছহীহ)*। তিনি আরো বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ এই যে, ব্যক্তি তার পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে' *(আহমাদ হা/৫৬১২; ছহীহুল জামে' হা/১৫২৫)*। অতএব মায়ের মৃত্যুর পরে মায়ের জন্য অধিকহারে দো'আ করবে এবং মায়ের সঙ্গী-সাথীদের সাথে ভালো আচরণ করবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে ক্ষমা পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন (২৫/৩৮৫) : ঈদগাহে শরীর চর্চার জন্য খেলা-ধূলা করা যাবে কি?

-শামীম আহমাদ, দোলেশ্বর, ঢাকা।

উত্তর : মসজিদ ও ঈদগাহের মত পবিত্র স্থানের সম্মান ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য বিনষ্ট হয়, এমন কোন খেলা-ধুলা জায়েয নয়। তবে সাধারণ খেলা-ধূলা বা শরীরচর্চা যা ছালাতের সময় নষ্ট করে না, সেগুলি জায়েয। রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় হাবশী যোদ্ধারা মসজিদে শরীর চর্চা করেছিলেন *(বুখারী হা/৪৫৪; মুসলিম হা/৮৯২)*। রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে নিষেধ করেননি। যা প্রমাণ করে যে, সাময়িকভাবে মসজিদসহ যেকোন স্থানে বৈধ শরীর চর্চা করা জায়েয *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২২/২০৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/৩০৯)*।

প্রশ্ন (২৬/৩৮৬) : নিফাসের সময়সীমা ৪০ দিন পূর্ণ করা আবশ্যক কি? এর পূর্বে রক্তের চিহ্ন দূরীভূত হ'লে ছালাত-ছিয়াম আদায় করা আবশ্যক কি?

-আবু ছালেহ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : নিফাসের সময়সীমা চল্লিশ দিন পূর্ণ করা আবশ্যক নয়। বরং যখনই নিফাস বন্ধ হবে, তখনই পবিত্র হয়ে ছালাত ও ছিয়াম আদায় করবে। কারণ নিফাসের সর্বোচ্চ সময়সীমা চল্লিশ দিন ও রাত হ'লেও সর্বনিম্ন সময়সীমা নির্ধারিত নেই

(আবুদাউদ হা/৩১১; ইরওয়া হা/২১১; নববী, আল-মাজমূ‘ ২/১৬৯; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১/২৫১)।

প্রশ্ন (২৭/৩৮৭) : একাকী ছালাতরত অবস্থায় অর্ধেক ছালাত আদায় করার পর ওযূ ভেঙ্গে গেলে ওযূ করে এসে অবশিষ্ট রাক‘আত না পুরো ছালাত নতুনভাবে আদায় করতে হবে?

-মামূন হোসাইন, লালবাগ, ঢাকা।

উত্তর : ছালাত অবস্থায় ওযূ ভেঙ্গে গেলে ছালাত ছেড়ে দিবে এবং ওযূ করে নতুনভাবে ছালাত শুরু করবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, ছালাতরত অবস্থায় তোমাদের কেউ যখন নিঃশব্দে বাতাস বের করে, সে যেন ফিরে গিয়ে ওযূ করে এসে পুনরায় ছালাত আদায় করে নেয় *(আবুদাউদ হা/২০৫; মিশকাত হা/১০০৬, সনদ হাসান, তারাজু‘আতে আলবানী হা/২৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/৪৩৮; বিন বায, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১০/১৫৯)*।

প্রশ্ন (২৮/৩৮৮) : আমাদের এলাকায় হাত তুলে মুনাজাতের পূর্বে একবার সূরা ফাতিহা ও তিনবার সূরা ইখলাছ পড়া হয়। এটা সঠিক হবে কি?

-মুহাম্মাদ সেলিম, টমটম ব্রীজ, কুমিল্লা।

উত্তর : জামা‘আতবদ্ধভাবে হাত তুলে মুনাজাত করা বিদ‘আত *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৪/১৯০)*। এর সাথে আবার সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাছ পাঠের বিধান যুক্ত করা আরেক বিদ‘আত। বরং মুনাজাতের সুন্নাতী তরীকা হ’ল একাকী হাত তুলে মুনাজাত করা *(আবুদাউদ হা/১৪৮৮; মিশকাত হা/২২৪৪; ছহীহুত তারগীব হা/১৬৩৫)*। আর দো‘আর পূর্বে আল্লাহ্র প্রশংসা করা এবং রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা *(আবুদাউদ হা/১৪৮১; নাসাঈ হা/১২৮৪)*। এছাড়া সিজদা ও ছালাতের শেষ বৈঠক মুনাজাতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সময় *(বুখারী হা/৮৩৫; মুসলিম হা/৪৮২; মিশকাত হা/৯০৯, ৮৯৪)*।

প্রশ্ন (২৯/৩৮৯) : একজন নারীর সামনে অপর নারীর পর্দার বিধান কি? একে অপরের সামনে শরীরের কতটুকু অংশ খোলা রাখতে পারবে? দলীল ভিত্তিক জানতে চাই?

-ইশরাত নওরীন, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : একজন নারী থেকে আরেকজন নারীর পর্দা হ’ল মাহরাম পুরুষদের থেকে পর্দার ন্যায় *(নূর ২৪/৩১)*। সেজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন নারী যেন অপর নারীর লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায়। একইভাবে কোন পুরুষ যেন অন্য পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায় *(ইবনু মাজাহ হা/৬৬১; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৮০০)*। অর্থাৎ কোন কারণে গোপন স্থান প্রকাশ পেয়ে গেলে সেদিকে তাকাবে না। আর এই আমলই রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ থেকে অদ্যাবধি মুসলিম নারীদের মাঝে প্রচলিত আছে। অর্থাৎ মুসলিম নারীরা অপর নারীদের থেকে তাদের হাত, পা ও মাথা ছাড়া দেহের অন্যান্য অংশ ঢেকে রাখবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৭/২৯২)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৯০) : দুধ বোন দুধ ভাইয়ের সামনে কি পরিমাণ পর্দা করবে? নিজ ভাই ও দুধ ভাইয়ের মধ্যে পর্দা করার ক্ষেত্রে ভিন্ন কোন বিধান আছে কি?

-মুনতাছির, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : দুধ ভাই ও বোন থেকে ততটুকু পর্দা করবে যতটুকু নিজ ভাই ও বোন থেকে করা আবশ্যক। অর্থাৎ দুধ ভাই দুধ বোনের হাত, পা, মাথা, মুখমণ্ডল ও চুল দেখতে পারে যেমন অন্যান্য মাহরামরা দেখতে পারে। আল্লাহ বলেন, তোমাদের জন্য হারাম করা হ’ল- তোমাদের মা, মেয়ে, ফুফু, খালা, ভাতিজী, ভাগিনেয়ী, দুধ-মা, দুধ-বোন’ *(নিসা ৪/২৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘বংশীয় সূত্রে যে সকল মহিলাকে বিবাহ করা হারাম, দুগ্ধপান সূত্রেও সেসকল মহিলাকে বিবাহ করা হারাম’ *(বুখারী হা/২৬৪৫; মুসলিম হা/১৪৪৫-৪৭; মিশকাত হা/৩১৬১)*।

প্রশ্ন (৩১/৩৯১) : শুক্রবারে সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় নিয়মিতভাবে নফল ছিয়াম রাখতে চাই। সেক্ষেত্রে আগে-পরে মিলিয়ে ছিয়াম পালন করা যাবে কি?

-ইকরাম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : এককভাবে শুক্রবারে ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ। তবে আগে বা পরে মিলালে তাতে কোন দোষ নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘অবশ্যই কেউ যেন স্রেফ জুম‘আর দিনে ছিয়াম না রাখে। তবে যদি তার একদিন আগে কিংবা পরে রাখে তাহ’লে তাতে ক্ষতি নেই *(বুখারী হা/১৯৮৫)*। অর্থাৎ শুক্রবারের সাথে বৃহস্পতিবার কিংবা শনিবার ছিয়াম রাখলে কোন দোষ নেই। তিনি আরো বলেন, ‘আর দিনগুলোর মধ্যে শুধু জুম‘আর দিনকে ছিয়ামের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়ো না। তবে যদি তোমাদের কেউ সর্বদা (নফল) ছিয়াম পালন করে আর এ ছিয়ামের (ধারাবাহিকতার) মধ্যে জুম‘আর দিন এসে যায়, তাহ’লে ভিন্ন কথা *(মুসলিম হা/১১৪৪; মিশকাত হা/২০৫২)*। উম্মুল মুমিনীন জুয়াইরিয়াহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) জুম‘আর দিন তাঁর কাছে আসলেন তখন তিনি ছিয়াম অবস্থায় ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি গতকাল ছিয়াম রেখেছিলে? তিনি বললেন, না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি আগামীকাল ছিয়াম পালনের ইচ্ছা আছে? তিনি বললেন, না। তিনি বললেন, তাহ’লে ছিয়াম ভঙ্গ কর *(বুখারী হা/১৯৮৬)*। অতএব কেবল শুক্রবারে ছিয়াম পালন করা সমীচীন নয়।

প্রশ্ন (৩২/৩৯২) : জেনে বা না জেনে চুরিকৃত জিনিস ক্রয় করা যায় কি?

-জাহিদুল ইসলাম, সবুজবাগ, ঢাকা।

উত্তর : জানার পরে চোরাই মাল ক্রয় করা নিষিদ্ধ। তবে অজ্ঞাত অবস্থার কথা ভিন্ন। মহান আল্লাহ বলেন, ‘পাপ এবং অন্যায়ের কাজে তোমরা একে অপরের সহযোগিতা করো না’ *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৯৩) : আমাদের মসজিদের ইমাম দীর্ঘক্ষণ মুছল্লীদের দিকে ফিরে বসে থাকেন। ফলে মুছল্লীগণ বিরক্ত বোধ করেন। এক্ষণে ফরয ছালাত শেষ হওয়ার পর ইমাম কোন মুখী হয়ে বসবেন?

-ডা. ফরহাদুদ্দীন, নাচোল, নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ছালাতের সালাম শেষে ইমাম ডাইনে অথবা বামে ঘুরে সরাসরি মুক্তাদীগণের দিকে ফিরে বসবেন *(বুখারী হা/৮৫২; মুসলিম হা/৭০৭; মিশকাত হা/৯৪৪-৪৬)*। আর ইমামের ঘুরে

থাকাতে মুছল্লীর বিরক্তির কোন কারণ নেই। তবে ইমামের কোন কথার বলার প্রয়োজন না থাকলে এবং মুছল্লীরা সুন্নাত শুরু করলে ইমাম ডানে বা বামে ঘুরে গিয়ে অবশিষ্ট যিকির-আযকার পাঠ করবেন *(মির'আতুল মাফাতীহ ৩/৩০৩)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৯৪) : ছয় মাসের ভেড়া কুরবানী করা যাবে কি?

-আবুবকর ছিদ্দীক, ঢাকা

উত্তর : ছয় মাসের ভেড়া কুরবানী করা যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে ছাহাবীকে অনুমতি দিয়েছিলেন সেটা তার জন্য খাছ ছিল *(ইরওয়া ৪/৩৫৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৯৫) : দাফন শেষে কবরের পার্শ্বে একাকী বা সম্মিলিতভাবে হাত তুলে মুনাজাত করা যাবে কি?

-আব্বাস আলী, সালথা, ফরিদপুর।

উত্তর : দাফন শেষে মাইয়েতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। হযরত ওছমান (রাঃ) বলেন, 'মৃত ব্যক্তিকে দাফন শেষে নবী কারীম (ছাঃ) সেখানে দাঁড়াতেন এবং উপস্থিত লোকদেরকে বলতেন, 'তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ঈমানের উপর দৃঢ় থাকার জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ কর। কারণ এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে' *(আবুদাঊদ হা/৩২২১; মিশকাত হা/১৩৩; ছহীহুত তারগীব হা/৩৫১১)*। সেজন্য বিদ্বানগণ বলেন, দাফনের পর মাইয়েতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা সুন্নাত। তারা বলবে, *'আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়া ছাব্বিতহু'* (হে আল্লাহ তুমি তাকে ক্ষমা কর ও দৃঢ় রাখ)। এক্ষণে দাফনের পর হাত তুলে জামা'আতবদ্ধ মুনাজাতের ব্যাপারে কোন হাদীছ বা আছার বর্ণিত হয়নি। তাই মাইয়েতের মাগফিরাতের জন্য প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে দো'আ পাঠ করবে। কেউ একাকী হাত তুলে প্রার্থনা করলেও দোষ নেই। তবে এটিও নিয়মিত করা যাবে না। কারণ নিয়মিত করলে সেটি বিদ'আত হিসাবে গণ্য হবে এবং বড় বিদ'আতের দুয়ার উন্মুক্ত করবে *(শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৪/১১০ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৯৬) : মসজিদের কিছু জমি সরকার অধিগ্রহণ করে ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। উক্ত টাকা কি জমি ওয়াকফকারী না মসজিদ কর্তৃপক্ষ পাবে? এটা দিয়ে মসজিদের উন্নয়ন বা ইমাম-মুওয়াযযিনের বেতন দেওয়া যাবে কি?

-গোলাম মাওলা, বটিয়াঘাটা, খুলনা।

উত্তর : সরকার মসজিদের জমি অধিগ্রহণ করেছে এর ক্ষতি পূরণ মসজিদই পাবে, দাতা নন। কারণ জমিদাতা শর্তহীনভাবে তার জমি মসজিদে ওয়াকফ করেছেন। বর্তমানে উক্ত জমির মালিক মসজিদ। এক্ষণে মসজিদ কর্তৃপক্ষ মসজিদ সংশ্লিষ্ট যেকোন কাজে উক্ত অর্থ ব্যয় করতে পারেন। প্রয়োজনে মসজিদের ইমাম বা মুওয়াযযিনের বেতনও দিতে পারেন *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৭/৩১; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১০/৫৫)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৯৭) : ওযূ করার সময় ক্বিবলামুখী হওয়া কি ওয়াজিব? এছাড়া ওযূ করার সময় প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার কোন দো'আ আছে কি?

-এস. আলম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

উত্তর : ওযূ করার সময় ক্বিবলামুখী হওয়াকে অধিকাংশ বিদ্বান মুস্তাহাব বলেছেন, ওয়াজিব বলেননি *(নববী, আল মাজমূ' ১/৪৬৫)*। কিন্তু মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে কোন হাদীছ বা আছার পাওয়া যায় না। সুতরাং মুছল্লী যে দিকে মুখ করে ওযূ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে, সেদিকে মুখ করে ওযূ করবে *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৭/২)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৯৮) : দাজ্জাল আসবে ক্বিয়ামতের পূর্বে। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক দাজ্জালের ফিৎনা থেকে পানাহ চাওয়ার কারণ কি ছিল?

-মাযহারুল ইসলাম, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) নিজে সর্বদা দাজ্জালের ফিৎনা থেকে পানাহ চেয়েছেন। তিনি স্বীয় উম্মতকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং তার অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়ার দো'আ শিখিয়েছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৫৯ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়)*। কেবল আমাদের নবীই নন বরং সকল নবীই স্ব স্ব উম্মতকে দাজ্জালের ব্যাপারে সাবধান করে গেছেন *(আবুদাঊদ হা/৪৩১৬)*। কারণ দাজ্জাল ক্বিয়ামতের পূর্বে আসলেও ক্বিয়ামত কখন হবে, সে ব্যাপারে কারু জানা নেই। আল্লাহ বলেন, তারা একে দূরে মনে করে। অথচ আমরা একে নিকটে মনে করি' *(মা'আরেজ ৭০/৬-৭)*। রাসূল (ছাঃ) ক্বিয়ামতের ব্যাপারে সর্বদা ভীত থাকতেন বলেই দাজ্জালের ফিৎনা থেকে পানাহ চাইতেন। সুতরাং আমাদেরকেও সর্বদা দাজ্জালের ফিৎনা থেকে পানাহ চাইতে হবে এবং ক্বিয়ামতের সেই ভয়াবহ দিবস আসন্ন বিবেচনা করে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯৯) : বর্তমানে সরকারী-বেসরকারী হাসপাতালে নার্সিং পেশায় পূর্ণ পর্দা রক্ষা করা সম্ভব নয়। কিন্তু নারীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে পর্দানশীন নারীরা নার্সকেই খুঁজে নেন। এক্ষণে নার্সিং পেশা গ্রহণ করার ব্যাপারে করণীয় কি?

-আতীকুল ইসলাম, কুয়াকাটা, পটুয়াখালী।

উত্তর : চিকিৎসা মানুষের মৌলিক চাহিদা সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা নারী-পুরুষ সকলের জন্যই একান্ত প্রয়োজন। সেকারণ নারীদের জন্য নারী এবং পুরুষদের জন্য পুরুষ চিকিৎসক ও নার্স থাকা এবং হাসপাতালগুলিতে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক বিভাগ থাকা আবশ্যক। এরূপ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নারীদের নার্স বা চিকিৎসকের দায়িত্বপালনে শরী'আতে কোন বাধা নেই। তবে এরূপ ব্যবস্থা না থাকলে সার্বক্ষণিক পর্দার মধ্যে থাকা এবং পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা সাপেক্ষে নারীরা নার্সিং বা চিকিৎসা পেশায় অংশগ্রহণ করতে পারে *(শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৯/৪২৫)*।

প্রশ্ন (৪০/৪০০) : কারো প্রতিকৃতি নির্মাণ ও তাতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা কী ধরনের অপরাধ?

-রাশিদা, বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম।

উত্তর : কোন প্রাণীর প্রতিকৃতি নির্মাণ করা এবং তাতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ *(আম্বিয়া ৫২)*। এটা বিধর্মীদের অনুকরণ যা শরী'আতে হারাম *(মায়েদাহ ৫১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে অন্যদের সাথে সাদৃশ্য রাখবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব তোমরা ইহূদী এবং খৃষ্টানদের অনুসরণ করো না' *(তিরমিযী হা/২৬৯৫, ছহীহাহ হা/২১৯৪)*।

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(আবুদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : জুলাই ২০২১ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ জুলাই	২০ যুলক্বা'দাহ	১৭ আষাঢ়	বৃহস্পতি	০৩:৪৭	১২:০২	০৩:২১	০৬:৫১	০৮:১৭
০৩ জুলাই	২২ যুলক্বা'দাহ	১৯ আষাঢ়	শনিবার	০৩:৪৮	১২:০৩	০৩:২২	০৬:৫১	০৮:১৭
০৫ জুলাই	২৪ যুলক্বা'দাহ	২১ আষাঢ়	সোমবার	০৩:৪৯	১২:০৩	০৩:২২	০৬:৫১	০৮:১৭
০৭ জুলাই	২৬ যুলক্বা'দাহ	২৩ আষাঢ়	বুধবার	০৩:৫০	১২:০৩	০৩:২৩	০৬:৫১	০৮:১৬
০৯ জুলাই	২৮ যুলক্বা'দাহ	২৫ আষাঢ়	শুক্রবার	০৩:৫১	১২:০৪	০৩:২৩	০৬:৫০	০৮:১৬
১১ জুলাই	৩০ যুলক্বা'দাহ	২৭ আষাঢ়	রবিবার	০৩:৫২	১২:০৪	০৩:২৪	০৬:৫০	০৮:১৫
১৩ জুলাই	০২ যুলহিজ্জাহ	২৯ আষাঢ়	মঙ্গলবার	০৩:৫৪	১২:০৪	০৩:২৫	০৬:৪৯	০৮:১৫
১৫ জুলাই	০৪ যুলহিজ্জাহ	৩১ আষাঢ়	বৃহস্পতি	০৩:৫৫	১২:০৪	০৩:২৫	০৬:৪৯	০৮:১৪
১৭ জুলাই	০৬ যুলহিজ্জাহ	০২ শ্রাবণ	শনিবার	০৩:৫৬	১২:০৫	০৩:২৬	০৬:৪৮	০৮:১৩
১৯ জুলাই	০৮ যুলহিজ্জাহ	০৪ আষাঢ়	সোমবার	০৩:৫৭	১২:০৫	০৩:২৬	০৬:৪৮	০৮:১২
২১ জুলাই	১০ যুলহিজ্জাহ	০৬ আষাঢ়	বুধবার	০৩:৫৮	১২:০৫	০৩:২৭	০৬:৪৭	০৮:১১
২৩ জুলাই	১২ যুলহিজ্জাহ	০৮ আষাঢ়	শুক্রবার	০৪:০০	১২:০৫	০৩:২৭	০৬:৪৬	০৮:১০
২৫ জুলাই	১৪ যুলহিজ্জাহ	১০ আষাঢ়	রবিবার	০৪:০১	১২:০৫	০৩:২৮	০৬:৪৫	০৮:০৯
২৭ জুলাই	১৬ যুলহিজ্জাহ	১২ আষাঢ়	মঙ্গলবার	০৪:০২	১২:০৫	০৩:২৮	০৬:৪৪	০৮:০৮
২৯ জুলাই	১৮ যুলহিজ্জাহ	১৪ আষাঢ়	বৃহস্পতি	০৪:০৩	১২:০৫	০৩:২৮	০৬:৪৩	০৮:০৬
৩১ জুলাই	২০ যুলহিজ্জাহ	১৬ আষাঢ়	শনিবার	০৪:০৫	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪২	০৮:০৫

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−২	−১	−১	−১	−১
গাযীপুর	−১	০	+১	০	+১
শরীয়তপুর	+২	+১	−১	−১	−১
নারায়ণগঞ্জ	০	০	−১	−১	−১
টাঙ্গাইল	০	+২	+৩	+৩	+৩
কিশোরগঞ্জ	−৪	−১	০	−১	০
মানিকগঞ্জ	+১	+২	+২	+১	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	০	−১	−১	−১
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	+২	+১	−১	−১	−১
গোপালগঞ্জ	+৪	+৩	০	+১	০
ফরিদপুর	+৩	+৩	+২	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	−২	+২	+৫	+৪	+৫
ময়মনসিংহ	−৩	০	+৩	+১	+৩
জামালপুর	−২	+২	+৫	+৪	+৫
নেত্রকোণা	−৫	−১	+২	+১	+২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৬	+৫	+৩	+৪	+৩
সাতক্ষীরা	+৮	+৬	+৩	+৩	+২
মেহেরপুর	+৭	+৮	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৫	+৪	+২	+২	+২
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৭	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৬	+৬	+৫	+৬
মাগুরা	+৫	+৪	+৩	+৩	+৩
খুলনা	+৬	+৪	+১	+১	+১
বাগেরহাট	+৬	+৩	০	০	−১
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৪	+৪	+৪

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+৪	+১	−২	−২	−৩
পটুয়াখালী	+৪	+১	−৩	−৩	−৪
পিরোজপুর	+৫	+২	−১	−১	−২
বরিশাল	+৩	+১	−৩	−২	−৩
ভোলা	+২	−১	−৪	−৩	−৪
বরগুনা	+৬	+২	−৩	−২	−৪

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+১	+৩	+৫	+৪	+৫
পাবনা	+৪	+৫	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+১	+৫	+৭	+৬	+৭
রাজশাহী	+৫	+৮	+৯	+৮	+৯
নাটোর	+৪	+৬	+৮	+৭	+৮
জয়পুরহাট	+১	+৬	+৯	+৮	+১০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৬	+৯	+১১	+১০	+১১
নওগা	+৩	+৬	+৯	+৮	+৯

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	−১	+৮	+১৪	+১২	+১৫
দিনাজপুর	+১	+৭	+১২	+১০	+১৩
লালমণিরহাট	−৩	+৪	+১০	+৮	+১০
নীলফামারী	−১	+৭	+১২	+১০	+১৩
গাইবান্ধা	−১	+৪	+৮	+৬	+৮
ঠাকুরগাঁও	+১	+৮	+১৪	+১২	+১৫
রংপুর	−২	+৫	+১০	+৮	+১১
কুড়িগ্রাম	−৩	+৩	+৮	+৭	+৯

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−২	−৩	−৪	−৪	−৪
ফেনী	−২	−৪	−৬	−৬	−৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৪	−২	−২	−৩	−২
রাঙ্গামাটি	−৪	−৭	−১০	−১০	−১০
নোয়াখালী	০	−২	−৫	−৫	−৬
চাঁদপুর	০	−১	−২	−২	−৩
লক্ষ্মীপুর	+১	−১	−৪	−৪	−৪
চট্টগ্রাম	−২	−৫	−৯	−৯	−১০
কক্সবাজার	০	−৬	−১৩	−১১	−১৩
খাগড়াছড়ি	−৫	−৬	−৮	−৮	−৮
বান্দরবান	−৩	−৭	−১১	−১১	−১২

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৯	−৫	−৩	−৪	−২
মৌলভীবাযার	−৮	−৫	−৩	−৪	−৩
হবিগঞ্জ	−৬	−৪	−২	−৩	−২
সুনামগঞ্জ	−৮	−৪	০	−২	০

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

- কুরবানীর পরিচয়, গুরুত্ব ও ফযীলত।
- কুরবানীর উদ্দেশ্য ও ইতিহাস।
- ঈদায়নের মাসআলা-মাসায়েল।
- কুরবানী করার সঠিক নিয়ম-পদ্ধতি।
- কুরবানী সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা-মাসায়েল।
- আক্বীক্বা সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

রাজশাহী অফিস : নওদাপাড়া (আমচত্বর), ফোন : ০৯৬১১৯৯৯৬৬৬ মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০ (ইমো,) ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।
Email : tahreek@ymail.com ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১ (বিকাশ)।

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 24, Issue 10, July 2021

ইয়াতীমখানা ভবন নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্‌সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত সুধী! 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ইয়াতীম শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণের জন্য পৃথক একটি ৬ তলা 'ইয়াতীমখানা ভবন'-এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত নির্মাণ কাজে আর্থিক সহযোগিতার জন্য দেশ-বিদেশের দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি আমরা উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে ছাদাক্বায়ে জারিয়ার এই অনন্য খাতে দান করে পরকালীন নাজাতের পথ সুগম করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

১. পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প
হিসাব নং ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

২. আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী ইয়াতীম ফাণ্ড
হিসাব নং ২০৫০১১৩০২০০৩৬৮৯০০
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

৩. বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭

নির্মাণাধীন ইয়াতীমখানা ভবন

যোগাযোগ : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (বালিকা শাখা)

নওদাপাড়া, রাজশাহী

রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় তিন হাযার শিক্ষার্থীর আবাসন ও পাঠদান সুবিধা সম্বলিত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (বালিকা শাখা)-এর বৃহদায়তন ক্যাম্পাসের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পে ৫টি আবাসিক, ২টি একাডেমিক ও ১টি প্রশাসনিক ভবনসহ ১টি স্টাফ কোয়ার্টার এবং ১টি মসজিদ থাকবে ইনশাআল্লাহ। ইতিমধ্যে ১টি ৮তলা আবাসিক ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং দোতলার ছাদ ঢালাই হয়ে গেছে। নেকী উপার্জনের অনন্য মাস পবিত্র রমাযানে দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে সহযোগিতার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করুন-আমীন!

মাস্টারপ্লান

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৩৬৬, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

বিকাশ : ০১৭৯৬-৩৮১৫৪২, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭, রকেট : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭২। সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৫-০০২৩৮০